পরস্ত্রী

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩,

PARASTRI

A Bengali Novel

By **SHYAMAL GANGOPADHYAY**

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
এস. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
গৌতম রায়

নব পর্যায়ে
১ম সংস্করণ
আষাঢ়, ১৩৭১

স্বাতী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে

সব চরিত্র কাল্পনিক। দুই বয়সের ব্যবধান পরস্পরকে অপরিচিত করে তোলে। সেখানে একটা দুঃখ থাকে। বয়স্ক মন তা টের পেয়ে নিজের কোটি থেকে বেরিয়ে গিয়ে কখনো কখনো হাত বাড়িয়ে দেয়। দিয়েও মেলাতে পারে না। তখন ভাগ্যে জোটে ডবল দুঃখ।

শ

সাতাশ বছর তিন মাস বয়সে আমি বিয়ে করি। তার আগে একবার উনিশে, আরেকবার পঁচিশে খুব বিয়ের ইচ্ছে হয়েছিল। বিয়ের জন্যে বিয়ে নয়। একটি মেয়েকে কাছাকাছি নিজের মতো করে পাওয়া, তা নিয়ে কারও কিছু বলার থাকবে না—এই হিসেবেই বিয়ে মাথায় আসে। তা দু'বারই দাগা খাই।

প্রথমবার কিছু প্রবল। প্রায় শোক-পালন করেছিলাম। নাগাড়ে উনত্রিশ দিন না খেয়ে থেকে তরতাজা ভাবটাই হারিয়ে ফেললাম। তখন মেঘে আরতি, বৃষ্টিতে আরতি, আলোয় আরতিকে দেখতে পাই। কলকাতার এমাথা ওমাথা হেঁটে কাবার করে দিচ্ছি। আরতি বসু সেই সময়কার আলোড়ন সৃষ্টিকারী কর্ডরয়ের ব্লাউজ পরে এক ড্রাগিস্ট অ্যাণ্ড কেমিস্টের বড় ছেলেকে নিয়ে এই কলকাতার বুকেই প্রায় হনিমুন করে বেড়াচ্ছিল। কতদিন সামনে পড়ে যায়। ব্লাউজগুলোও চেনা। কমলার খোসা মনে হতো। পরে বুঝেছি বিরহ-টিরহ কিছু নয়। আসলে তখনকার আমাকে আরতি আমল দেয়নি বলেই অত কষ্ট।

কিশোর বয়সের পরেই প্রেম ভালবাসা ব্যাপারটাকে কয়েকটা মডেল ছবি করে মনে গেঁথে রেখেছিলাম। যেমনঃ যাকে ভালবাসব তার জন্যে সব করতে পারি—সেও সব পারবে। জীবন তুচ্ছ ইত্যাদি। সে ছবি আরতিই ভেঙে দিল। তখনো দুনিয়া এত কঠিন হয়ে যায়নি। ও দিব্যি আমাকে ছেড়ে অবলীলায় শাঁসালো ড্রাগিস্ট সন্তান ধরলো। তাও কিছু খারাপ ছিল না। সহ্য হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বছর দুয়েক বাদে ছেলেটি তার বিয়ের কার্ডে ভাবী বউয়ের ছবি ছাপিয়ে নেমন্তন্ন চিঠি পাঠালো। দেখা হতে ছেলেটি বললো, এমন রটে গিয়েছিল, পাছে লোকে ভাবে আরতিকেই বিয়ে করছি—তাই—

এখানেই আমার প্রথম বড় ধাক্কা লাগে। মডেল ভালবাসার ভিত

নড়ে গেল। আর বেলতলায় যাব না। পাঁচ-ছ' বছর কেটে গেল। তখন দেখলাম, রবীন্দ্রনাথ দিব্যি সাটে কবিতা লিখেছেন। তুমি, তুমি করে যেসব কথা—ভগবানকেও বলা যায়—আবার লাভ্‌-লেটারেও কোট করা চলে।

আমি আবার একটি আছাড় খেলাম। সরল, কালোকেলো, অতি সদাশয় মেয়েটি। পড়াশুনোয় ভাল। যাকে বলে পঙ্কজ। একেবারে পিওর তাই। বাবা ওষুধ ব্ল্যাক ও বর্ডার দিয়ে স্মাগল করে কলকাতার উঠতি পাড়ায় বাড়ি বানিয়ে অল্পদিন ভদ্রলোক হয়েছে। বেশ মিষ্টি মেশানো ব্যাকগ্রাউণ্ড। তার ওপর নাম ছিল মনীষা। ইনাফ। চশমা খুললে নিস্তব্ধ দুই চোখ। মাঠে বসলে গান গায়—মনে হয়, ভালবাসা জাভা চিনির দানা হয়ে ঠোঙা ছিঁড়ে ঝুর ঝুর করে পড়ছে। এত সুন্দর গলা। তা নিয়ে কোনো গর্ব ছিল না মনীষার।

সেই মনীষা চেয়েছিল, আমি যেন ওর বাবার মনোমতো পাত্র হতে চেষ্টা করি। অর্থাৎ, যাতে বাড়ি-গাড়ি সম্বলিত সালঙ্করা কন্যার সঙ্গে সঙ্গে আমিও যেন কিছু দেখাতে পারি। কিন্তু আমার দেখানোর কিছুই ছিল না। আমার কেন যেন সর্বদাই আশঙ্কা থাকতো, মনীষা আমার হওয়ার নয়। তাই গভীর, ঘন ভালবাসা-বাসির সময়েও আমি মনে মনে ভেবে নিতাম মনীষা নেই। একেই আমার চোখ বিষণ্ণ। তাতে আরও বিষণ্ণ হয়ে যেতাম। তখনই মনীষা আমাকে মরিয়া হয়ে ভালবাসতে চাইতো। ব্যাপারটা আরতি বসুর চেয়ে অনেক সলিড আর শাস্ত, তাই বোধহয় আর ও বেশি দুঃখের।

মনীষা চেয়েছিল, তার লাভারের মাথার চুল হবে কোঁকড়া, চোখে থাকবে চশমা, গলায় গান। শেষের দুটো ছিল না। তাতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। মনীষা চাইতো, আমার যেন জ্বর—কিংবা তেমন যত্ন হয় না বাড়িতে, তাই পুষ্টির দরকার। অতএব ও পুষ্টির জন্যে গোপনে আমাকে ব্যাগ থেকে পুষ্টিকর জিনিস বের করে খাওয়াতো। বেশ চলে যাচ্ছিল। বানিয়ে বলতে বলতে মনীষার কাছে আমি অপুষ্টির পেসেণ্ট হয়ে পড়েছিলাম প্রায়।

তখনো আমার আট বছর বয়সের কথা, ক্লাস ফাইভের হিস্ট্রি বইয়ের নাম, আরপুলি লেনে কোন্ দোকানে বিভুর কাকা কাজ করে—এসবই মনে ছিল। মনে থাকতো। আরতির এক ধাক্কায় শৈশব ভুলে যাই। মাঝে মাঝে মনে হতো : ওসব কথা আমার ছেলেবেলার নয়। এসব অন্য কারও। যেমন পরের বাগানের পাতাবাহারে পথের ধূলা লেগে থাকে। টোকা দিলেই পড়ে যায়—তেমন আর কি।

মনীষার ধাক্কায় আমি সব ভুলে গেলাম।

ও সরলভাবেই বললো, বাবার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ও আমার সঙ্গে বিয়ে বসতে পারবে না।

যুক্তি দিয়ে বোঝালাম। কাজ হলো না। ভয় দেখালাম, সুইসাইড করব। মনীষা উপদেশ দিল, আত্মঘাতী আত্মার সদ্‌গতি হয় না। ততক্ষণে আমার ভালবাসা ফুরিয়ে গিয়ে স্রেফ একটা দর কষাকষি পড়েছিল। কিংবা সাধ্যসাধনা। বিনা মাঙে মোতি মিলে—মাঙে না মিলে ভিখ। আর বোধ হয়, ভিক্ষে করে ভালবাসা ছাড়া সবই পাওয়া যেতে পারে।

কোন্ যুদ্ধ করে মনীষাকে পাওয়া যায় জানতাম না। লোকারণ্য পিচ রাস্তায় দাঁড়িয়ে শেষকালে কথা হতো। বারুদ আবিষ্কারের পর থেকে তরোয়ালের যুগের বীরত্ব, শিভালরি ইত্যাদি কবে ফিকে হয়ে গেছে। যা ছিল, নগর আর নাগরিকতা বাকিটুকু রেসপেক্টে-বিলিটি দিয়ে আক্রমণ করে ফিনিশ করে দিয়েছে। তাই আমি পঁচিশে নিষ্ফল হয়ে ফিরে আসি। ভালবাসার রণাঙ্গনে আমার প্রথম যৌবনের শব পড়েছিল।

সেবার আমি সব ভুলে যাই। চব্বিশের আমার কাহিনীও আমি বেমালুম ভুলে মেরে বসে থাকি। ভাবলাম, গোঁফ দাড়ি রাখি। তিন দিনের গাল সেভ করে আয়নায় দেখলাম, মন্দ দেখাচ্ছে না তো। তখন ডিমসেদ্ধ খেতে শুরু করলাম—হাফ বয়েল। ডাল চুমুক দিয়ে খাই। ফ্যানে ঘি মিশিয়ে খেয়ে দেখি পৃথিবীর রস খাচ্ছি যেন। কথাবার্তায় কিন্তু জড়ভরত হয়ে যাচ্ছিলাম। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে রসিকতা

করতে গিয়ে বুঝলাম, আমার হাসির কথায় শুধু আমি একাই হাসি। তার মানে আমি একটি সিম্পল বোর।

এক বন্ধু আমায় নিয়ে গিয়ে একদিন বিকেলের দিকে ভবানীপুরের এক জিমনাসিয়ামে ভর্তি করে দিল। আখড়ার অধ্যক্ষ চুলে বেঁধে বারবেল তোলেন, দাঁতে দু'শো পাউণ্ডের লোহার বল ঝুলিয়ে রাখেন।

আমি উদ্বুদ্ধ হলাম। মাসখানেকের মধ্যে আশিটা বৈঠক দিচ্ছি, তিরিশটা বুকডন। তিন মাসের মাথায় বেঞ্চপ্রেসে দিব্যি ওয়েট নিচ্ছি। রোজ গা দিয়ে লিটারখানেক ঘাম ঝরে। বন্ধুবর একদিন আখড়ায় এসে আমার চনমনে দেহযষ্টি টিপে টিপে বললো, ফাইন! বিরহজ্বর কাটিয়ে উঠেছ দেখছি। এবার তুমি বর্বর হবে—

মানে বুঝিনি। আমি তখন আমার অতীত সর্বৈব ভুলে বসে আছি। দিনে দু'বার জুতো পালিশ করাই। ফুলসার্টের হাতা উপচে আমার ল্যাটিস ডরমাস ঝলকায়। বাইসেপ পারলে ডানা মেলে আমাকে আকাশে তুলে ধরে। বিহঙ্গ করে তোলে। আমার পরিচয়—পেটে মেদ নেই, নিশ্বাস টেনে ছাতি ফোলালে একচল্লিশ ইঞ্চি। ওজন যেন কত স্টোন, ঠিক মনে নেই। আমি শুধু বাবার ছেলে, ভাইদের দাদা, ভাইপোর কাকা, বোনের দাদা। রেশন কার্ডে কত গ্রাম চিনি, গম, চাল তখন বরাদ্দ ছিল তা বলতে পারব না।

রোজ মনে হতো এই ভোরবেলাই আমার জীবনের শুরু। পৃথিবীতে রোজ সকালে কত আলো ফোটে। কলকাতায় গুলি চললে খুব মজা লাগত। বয়স্কদের একেবারে গট-আপ চোর চোর খেলা। এই অবস্থায় আমার দু'দুটো বছর কেটে গেল। সবাই পছন্দ করে। কিন্তু ভালবাসে না। বাসবে কি করে? আমার মানে তো বোঝে না। বোঝাই কি করে। আমার মানে তো আমিই বুঝি না। কেননা, আমার তো বইবার মতো কোনো অতীত নেই। ফলে মন নেই। কোনো মত নেই। পুরনো কথা ফেইণ্ট মনে পড়ে স্বপ্নে। চেনা লোকের নাকমুখ স্বপ্নে পর্যন্ত ঘোলা লাগে।

রিজাইন দেব বলে নেহরু তখন ইণ্ডিয়াসুদ্ধ লোককে প্রায়ই ভয়

দেখান। বুকে গোলাপ, হাতে ম্যাজিকওয়াণ্ড, এরোপ্লেনে ঘুমোন, চশমা চোখে ফাইল দেখেন—কিন্তু মাথার গান্ধীটুপি কিছুতেই কখনো খোলেন না। বুঝলাম ভদ্রলোক আমাদেরই মতো মানুষ। মাথায় চুল নেই বলে খুব দুঃখ।

এটা বুঝতে পেরেছি, বুঝে আমিই চমকে উঠলাম। এসব তো কিছুদিন মাথায় খেলছিল না।

সতর্ক হওয়া দরকার। কিন্তু ততদিনে বেশ দেরি হয়ে গেছে। জিমনাসিয়াম যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। একটা কাজে লেগেছিলাম। সরল সাধারণ কাজ। রাত দুটো থেকে ভোর পাঁচটা অব্দি ডিউটি। রেলের বিভিন্ন ইয়ার্ডে চেনাপথ দিয়ে ঢুকতে হতো। সাবান, কাপড়, চিনি, লোহা—যা কিছু হোক ওয়াগনের গন্ধ শুঁকে বলে দিতে পারতাম। বিভু চলন্ত মালগাড়ির গা থেকে মাল খসাতে খসাতে যেত। আমি আর পাঁচজনের সঙ্গে সেগুলো অন্ধকার স্লিপারের পাশ দিয়ে কুড়িয়ে নিতাম।

আমার হাইট পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি। দামি শার্টের পকেটে নোটের পাতি থাকে। কোমরে নকল রুপোর মকর লাগানো বেল্ট। কথা বলি ছায়াছবির বেপরোয়া নায়কের ঢঙে। কে বলবে, আমি একদিন লাভার ছিলাম—আমি একদা গুনগুন করে কাউকে গাইতে শুনলে দাঁড়িয়ে পড়ে সুরের ভেতরকার কথাগুলো চিনে নিতে চাইতাম।

এখন স্বভাবতই একটা প্রশ্ন আসতে পারে। আমি কে! কি আমার ব্যাকগ্রাউণ্ড। আমাকে নিয়ে এত সাত কাহনের কি আছে!

আমিও তাই জানতে চাই। এসব আমারও প্রশ্ন।

একদিন বিকেলে এসপ্ল্যানেডে দাঁড়িয়ে ভাবছি, আহা! দুনিয়াটা কত রঙিলি। মেয়েছেলেদের একটুকরো পেট কেমন কাপড়জামার বাইরে মাপসই পড়ে থাকে। গঙ্গায় রোজ বিকেলে সূর্য লাল কালির ফাউন্টেন পেন ধুয়ে সারারাতের জন্যে অন্ধকার ভরে নেয়। নিজের জন্যেই বুকটা হু হু করে উঠলো। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে বুঝি আমার

আয়ু ফুরিয়ে যাবে। আমি সন্ধ্যের ঘোরে কয়েকবার দপদপ করেই শীষ তুলে নিভে যাব।

মা নেই। বাবা দাদাদের কাছে। ভাইরা দূরে দূরে। আমি একা কলকাতা আগলাচ্ছি। আরেকজন আছেন। তিনি পুলিশ কমিশনার। তাঁর লোকজন আমাকে কতদিন আদর করে নিয়ে যেতে এসেছে। ডেরায় পায়নি।

সবার জীবন কত সুখ। অথচ, আমি—এই জগদীশ রায়ের জীবনটা কেন সহজ হয় না। তার আগের রাতেই বেলুড় থেকে লিলুয়া অবধি একটা স্লো মোশান গুড্স্ ট্রেনের কল্পতরু গা থেকে আমি আর পাঁচজন মিলে গায়ে মাথার মোট সতেরোশো আশিখানা গ্লিসারিন সোপ কুড়িয়েছি।

এর পরেও কি আমার বেঁচে থাকার অধিকার আছে! একবার হাইকোর্টের দিকে তাকালাম। হে মহামান্য আদালত—আমার কি কোনো শাস্তি হবে না? একবার গভর্নর হাউসের দিকে তাকালাম। মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়, আমার ফাঁসি হলে দয়া করে যেন সে-আদেশ মকুব করে দেওয়া হয়। গলায় লাগবে।

তারপর আমি আর কোনো ইয়ার্ডে যাইনি। কোনো মালগাড়ির মাথায় অন্ধকার রাতে উঠিনি। এর মাঝে অনেক ডিটেল্স্ ছিল। সে-সবই আমি বাল্যকাল, কৈশোর, টাটকা যৌবনের মতোই একে একে ভুলে মেরে দিয়েছি। কনভিনসিং করে বলার মতো অনেক খুঁটিনাটিই আভাসে ইঙ্গিতে বলা যেত। কিন্তু ইচ্ছে নেই। আসলে ভাল লাগে না। ঘুম পায়।

বিরহকে ঘাম দিয়ে ছাড়ানোর জন্যে ব্যায়াম করেছিলাম। গরুর নরম নাকে খোঁচা দিলে অমন বড় জন্তুর মাথাটা নিশ্চয় ঘুরে যায়। আমার মনে প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি ডাণ্ডসের খোঁচায় খোঁচায় ঝাঁকুনি খেয়ে কোথায় গুলিয়ে গিয়েছিল। ডুব দিয়ে দেখলাম কিচ্ছু পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু কালো ঘোলা জল। স্যালো টিউবওয়েলের ধারায় গন্ধও দিচ্ছে।

কোনো জিনিসেই বিশ্বাস নেই। পায়ে কড়া বলে সাবধানে হাঁটি। লোকে কালীবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে নমস্কার ঠোকে। বাস ড্রাইভার রাস্তার গায়ে শীতলাতলায় পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে গিয়ার পালটায়। মহা মুশকিল! কাকে বিশ্বাস করি। নেতাগুলো পিচবোর্ড। পেনসিল কাটার চাকু বসিয়ে দিলেই গয়া হয়ে যাবে। এত আনপ্রোটেকটেড। শুধু জনগণ জনগণ বলে চেঁচায়।

আমি ঠিক করলাম সৎ হবো। যতদূর পারি।

খুব কঠিন কাজ।

ক'দিন পরে নিজেকেই নিজে কনসেসন দিলাম। বললাম, ভাই জগদীশ—তুমি দাগী না হলেও কিছু কম ক্রিমিন্যাল নও। তবে একটা সুবিধার কথা—তুমি সব ভুলে যাও বলেই দিব্যি বেঁচে আছ। তোমার মনে বা মুখে তাই বিশেষ দাগ পড়েনি।

বরং তুমি বলো, আমি এখনো যতটুকু সৎ আছি—অন্তত সেটুকু যেন থাকি। নতুন করে যেন কিছু আর না করি স্যার।

প্রেমের সময় ওমর খৈয়মের নরেন দেব পড়িনি। তবু বর্ষার কলকাতায় আরতির কথা ভেবে অভুক্ত জগদীশ আন্দাজে যক্ষের স্টাইলে যতীন দাস রোডের মাথায় ছিন্নভিন্ন মেঘ দেখেছে কখনো কখনো।

যে-বন্ধু জিমনাসিয়ামে ঢুকিয়েছিল—সে-ই এক নতুন কলেজে দয়ালু প্রিন্সিপ্যালকে ধরে বাকিতে ভর্তি করিয়ে দিল বি. এ.-তে। কো-এডুকেশন কলেজ। মেয়েদের ব্যাগের ডেপ্‌থ্‌ দেখে বলে দিতে পারি কার জিনিসে কি আছে। তবু কিছুতে হাত দিইনি। মেড-ইজি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সগোত্র হয়ে গেলাম। পড়াশুনো যে এমন সোজা —আগে যদি জানতাম। কোনো ওয়েট নেই। এক বস্তা জ্ঞান দিব্যি মাথায় ভরে ঘোরাফেরা করা যায়। সাবধানে থাকা চাই। বেচালে বড় জায়গায় না ঢুকলেই হলো।

আগে যদি জানতাম মা তার ছেলেদের মধ্যে আমার জন্যেই চোখের জল ফেলেছে সবচেয়ে বেশি। অথচ তখন যদি জানতাম পড়াশুনো

একটা ভাল খেলা। পরের জিনিস পড়ে পরের জন্যে খাতায় লিখে দিতে হয়। হাতের কাজ দেখানোর বিশেষ কোনো রিস্‌ক্‌ নেই।

নেশা ধরে গেল। ফট করে মোটামুটি একটা এম. এ. হয়ে গেলাম। তখন নতুন নতুন কলেজ খোলার যুগ। এক কথায় সব বোঝায়—সেই অধ্যাপক হয়ে গেলাম। এই সময় একটি মেয়েকে বিয়ে করি এবং যা যা করলে অল্পদিনে অন্তত মাটো লোকজনের কাছে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও যশস্বী হওয়া যায়—তাই করলাম। অর্থাৎ কলকাতার রাস্তাঘাটে আমার নামে পোস্টার পড়ে গেল: প্রোঃ রায়ের 'ফাইভ ইন ওয়ান'। নোট লিখে লিখে আমার হাতে কড়া পড়ে গেল।

সব সময় পাঞ্জাবি পরি। মার্জিতরুচি বলতে যা বোঝায় তেমন হাবভাব সবই রপ্ত হয়ে গেল। কাগজে সমাজবিরোধী কথাটা দেখলে শুধু গা চুলকোতো। কিন্তু ততদিনে আমি অনেক দূরে। কলকাতা ট্রেনে এক ঘণ্টার পথ। মফস্বল কলেজের কম্পাউণ্ডেই কোয়ার্টারে থাকি। গরু পুষি। মুলো, বেগুন লাগাই। হোস্টেলের ছেলেদের জন্যে আলু উঠলে পাঠাই। কলেজের সারা মাঠের ঘাস আমার একটি গরু খেয়ে ফুরোতে পারে না।

যাকে বলে সুখী গৃহকোণ—সেখানে আমি তখন অধিষ্ঠিত। আমার স্ত্রীর কথা কিছু বলা দরকার। তিনি কাটা কাটা নাক-মুখ-চোখের অধিকারিণী। বয়সটা যৌবনের মাঝামাঝি। আমায় একটি ছেলে দিয়েছে। বাড়ির দুধেই রসগোল্লা, সন্দেশ বানায়। একবার পেয়ারার জেলি করেছিল বই দেখে দেখে। ওর নাম হওয়া উচিত ছিল দয়া। সবার জন্যে প্রাণ কাঁদে। শ্বশুরমশায় নাম দিয়েছিলেন দেবী। আমিও তাই ডাকি।

আরতির সঙ্গে ভালবাসাবাসির সময় ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ছত্রিশ সাঁইত্রিশ কোটি। আমার ছেলে এখন দশ এগারো বছরের। ভারতে এখন চুয়ান্ন পঞ্চান্ন কোটি লোক। ট্রামে বাসে সিগারেট খাওয়া কতকাল উঠে গেছে।

দেবী শীতকালে নির্জন বারান্দায় বসে পুরনো সোয়েটারের উল খুলে

গুটি পাকিয়ে নেয়, নতুন সোয়েটার বোনে। গরমকালে আচার বানায়। রাতে ম্যাগাজিন পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লে আমিই আলো নিভিয়ে দিয়ে থাকি। কলেজের পড়া, ইউনিভার্সিটির খাতা, গভরনিং বডির রিজোলিউশন তৈরি—সবই আমি দেখি, আমি করি। সেবার মুখ্যমন্ত্রী এলেন। তাঁর স্বাগত প্রস্তাবও আমারই লেখা।

বিছানায় ঘুমন্ত দেবী, আমার ধুমন্ত খোকা, আলমারির লকারে ইনসিওরেন্সের কাগজ, গোয়ালে গরু, কোয়ার্টারের ছাদে ডিপলিটারে ডিমপাড়া দু'ডজন ব্ল্যাক মিনরকা—এসবই আমার। ভাবতেও অবাক লাগে। বিশ্বাস হয় না, এসব নিয়ে আমি নগর বসিয়েছি।

আমাদের বাড়ি লোকে সন্ধ্যেবেলা চা খেতে আসে। দেশ কোথায় যাচ্ছে তাই নিয়ে কথা হয় ম্যাথামেটিকসের প্রোঃ ঘোষের সঙ্গে। বাংলার প্রোঃ মুখার্জীর ক্লেইম, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে তিনি আমূল পরিবর্তন ঘটাবেন। কেননা হিট্টাইট গ্রুপের কিছু কিছু ফোনেটিকাল লক্ষণ তিনি এই আ মরি বাংলা ভাষাতেই পেয়েছেন। জয় ও আবিষ্কার এবং উপরন্তু দখলের নেশায় কত লোক মশগুল হয়ে আছে।

ঠিক এইসব আবহাওয়ায় একদিন রাতে শুয়ে শুয়ে দেবী বললো, 'আমাদের মালতী আবার বিয়ে করেছে।'

দেবী ওর নিজের মায়ের নিয়মেই চলে। খেতে বসলে পুরুষ মানুষ যখন খানিকটা ঢিলে থাকে কিংবা রাতে আলো নিভলে যখন কারও নাক গলানোর নেই—ঠিক তখনই ও কথা পাড়ে। ওর যা বয়েস যাচ্ছে তা বড় ভয়ের। এই সময়টা স্ত্রীলোক দেখতে বড় সুখের, বড় মনোহারী। উপরন্তু দেবী খুবই শান্ত, একটা অচেনা গম্ভীরভাব মুখখানা সব সময় দখল করে রাখে।

সতীন আমদানি হওয়ায় স্বামীর ঘর ছেড়ে একটি মেয়ে বেরিয়ে এসে জগদীশের মায়ের আমলে ওদের কলকাতার বাড়িতে থেকে যায়, লক্ষ্মীপুজোর ভোগ রান্না থেকে কাঁথা সেলাই সবই করতো অমলাদি। তারই সেই বারো-তেরো বছরের মেয়েটি মাত্র তিন বছরে দুটি বিয়ে করে ফেললো।

'প্রথমবারের কেস মিটে গেল ?'

'কেস মিটে ওর সেই স্বামীর জেল হয়ে গেল। তার আগের দেওরটি সুবিধের ছিল না।'

'তাতে কি ? দেওরের সঙ্গে তো বিয়ে হয়নি—'

'ভাগ্যিস হয়নি !'

মালতীর প্রথম বিয়েতে দেবী একখানা কাঞ্জিভরম পাঠিয়েছিল। সবাই মিলে দেওয়া বিয়ে। দেবীর বড়জা দিয়েছিল তার নিজের বিয়ের নাকছাবিখানা। কড়ি খেলা দেখে ফিরে এসে দেবী হেসে বলেছিল, 'ছেলের বন্ধুরা ছেলেকে বলেছে, ইয়া স্বাস্থ্যের মেয়েকে সামলাবি কি করে !'

মালতী কিছু মোটাসোটা।

'এই বিয়েটা কে দিলে গো—!' আমি আজকাল গো মিশিয়ে কথা বলি দেবীর সঙ্গে। ওদের বাড়িতে ওরা ওরকম কথা বলে—কেন গো—কি হলো গো ? এই রকম আর কি।

'কে আবার ! মালতীর চেনা-জানা ছেলে। এক পাড়াতেই থাকে।'

আমার স্ত্রী খুব সতীসাধ্বী। ওর কোনো আবেগ, ইচ্ছা থেকে থাকলেও কখনো প্রশ্রয় দেয় না। ফলে আমরা এদানী প্রায়ই বিছানায় ট্রামের দু'জন প্যাসেঞ্জার হয়ে পড়ে থাকি।

'তাহলে এই ছেলের সঙ্গেই আগে বিয়ে বসা উচিত ছিল।'

দেবী বললো, 'উচিতমতো সব তো আর সব সময় হয় না।'

'মাঝখান থেকে দু'দুটো বছর অন্য জায়গায় জড়িয়ে থাকতে হলো।'

'তাতে কি হয়েছে। মালতী আমাদের পুষিয়ে নেওয়ার মেয়ে। ভীষণ টক খায়। ভীষণ ঝাল খায়।'

'যে-বছর দু'টো গেল তা তো ওরা নতুন স্বামী-স্ত্রী কোনদিন আর ফিরে পাবে না। হারানো সময় ফিরে পাওয়ার কোনো পথ নেই—'

'তুমি থামো তো। এমনকি বয়েস ওদের। কত বছর সামনে পড়ে। যেমন ইচ্ছে বানিয়ে নিতে পারবে—'

'তবু জড়িয়ে থাকার ছবিগুলো ভুলতে কষ্ট হবে মালতীর। ওপক্ষে তো একটি ছেলেও হয়েছিল।'

'হয়েছিল হাসপাতালে। সেখানেই মারা যায়। তাখো বাপু, আমরা মেয়েমানুষ—জায়গা বুঝে ভাঙি, জায়গা বুঝে সরে আসি। নদী বলতে পারো—'

জগদীশ রায় তার স্ত্রীকে বোঝাতে চাইছিল, এক জায়গার স্মৃতি—বিশেষত স্ত্রী হয়ে থাকার স্মৃতি অন্য জায়গায় গিয়ে ফিরে স্ত্রী হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একমনা হয়ে স্বামীতে উদ্গত হওয়ার পক্ষে আগেকার হাসি, গান, ডালপালা রোদ ঢেকে দিতে চায় না! না চাইলে তো বড় চিন্তার কথা। তাহলে মেয়েমানুষ কি জিনিস দিয়ে তৈরি! অ্যাসবেসটস? কিছু ঢেউ তোলা ভাজ মাত্র। স্বাদ আহ্লাদ, বেগ আবেগ সামলানোর সাময়িক ব্যবহারিক আচ্ছাদন শুধু।

চল্লিশের কাছাকাছি জগদীশ রায় এভাবে ভাবে। সে আরো অনেককিছু ভাবে। গরুর গলকম্বলে সামান্য মারবেলের মালা কি সুন্দর শোভা পায়। অথচ দেবীর গলায় ছোট্ট ঘণ্টা বেঁধে দিয়ে যাকে বলে গোধূলি নাগাদ যদি ওকে নীলাম্বরী পরিয়ে যে কোনো মাঠ দিয়ে হাঁটিয়ে আনা যায়, তাহলে সেইসব ভাব কি মনে উদয় হবে—যেমন, বাৎসল্য, বনদেবীকা, দীঘির গায়ে ঝুলেপড়া ঝাঁকড়া আশফল গাছের ছায়া!

এখনো মাঝে মাঝে জগদীশ ঘুমের ভেতর ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালের লাল দগদগে চোখ এগিয়ে আসতে দেখতে পায়। লাইন পালটানোর সময় মালগাড়ির ঝটাপটি কাতরানি তাকে বিছানায় ভাজা ভাজা করে ফেলে।

আমি বেশ খাতা দেখে যাচ্ছিলাম। রেটরিক পড়াচ্ছিলাম। খুরপি দিয়ে কোয়ার্টারের সামনের শালিগমের শেকড় খুঁচিয়ে দিচ্ছিলাম। এর মধ্যে একবার শীতকালে শুনলাম, মালতীর নূতন বর চাকরি পায়নি। মালতীর গর্ভে দুটি যমজ মেয়ে হয়েছে। হপ্তা দুই পরে শুনলাম, নিউমোনিয়ায় দুটিই সাবাড়।

আমার এই শরীরটাকে নিয়ে খুব অসুবিধা যাচ্ছে। কোনো অসুখ নেই। সবসময় তাজা। কলেজ, সংসার ইত্যাদির পরিশ্রম আমার গায়েই লাগে না। মনে হয়, রাতে লাইট জ্বালিয়ে কলেজ কম্পাউণ্ডে আমি আরো তিন ঘণ্টা মাটি কোপালেও পরিশ্রান্ত হব না।

যা কিছু বাজে কাজ সবই আমি অল্প বয়সে করে শেষ করে ফেলেছি। নতুন কোনো বদখেয়াল আমার চাপেনি। লোকে জানে সচ্চরিত্র গৃহস্থ। আমিও আসলে তাই। কোনই ঝামেলা নেই। কারও পাকা ধানে মই দিই না। লোকে আমাকে পছন্দ করে। কিন্তু ভালবাসে না। ভালবাসবে কি করে। কেননা, আমাকে বোঝে না। আমিও আমাকে বুঝি না। আমার মন আমি জানি না।

বিরাট বড় বাড়ি। কোনো ভিড় নেই। একা ছাদে রোদ পোহাই শীতে। গরমে সেখানেই জ্যোৎস্নায় চান করি। বিশ-বাইশ মাইল দূরের কলকাতায় ঘটনা ঘটে। পরদিনের কাগজে সব দেখি। অতবড় একটা গোলমালের এত কাছে এত নির্জনে আছি। বেশ আছি।

দেবী অনেক দয়া করে একদিন ছাদে একটা গান গাইলো। রবীন্দ্রনাথের গান। তাতে অসীম ছিল, আকাশ ছিল, ঈশ্বর ছিল। আমি গানের মাঝখানে হঠাৎ আমার অতীত মনে করে ফেলেছিলাম। পেয়েও যাচ্ছিলাম হারানো জিনিসপত্তর।

এমন সময় দেবী গান থামিয়ে বললো, 'কাল ভোরে মালতীরা আসবে। আমরা তো আড়াইটি প্রাণী। ওদের তোমাকে জীবনে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। ঘর পড়ে রয়েছে—ওরা বেশ স্বামী-স্ত্রীতে এককোণে পড়ে থাকবে।'

ভারত সরকার, রাজ্য সরকার যা পারেনি আমাকে তাই করতে হবে। ফাইন! আমি ওই দু'জনের পক্ষে জীবনে দাঁড় করানোর সিঁড়ি। দেবী এমন দেবীর মতো করে বলে দিল। আমি ভগবান হলে বলে দিতাম, তথাস্তু। কপাউণ্ডের ভেতরে কলাগাছের মাথায় বিভিন্ন সেডের ছায়া।

পরদিন ভোরে মালতী একা এল। তোরঙ্গে আঁকা গোলাপ ফুল ধুলোয় মাখামাখি। কাঁধের ঝোলায় কিছু জামা-কাপড়। হোস্টেলের ছু'খানা বাতিল চৌকি আমাদের বাড়িতেই পড়ে ছিল। বাগানের মালী দৈতরি সবই গুছিয়ে রেখেছিল। মায় কুজো পর্যন্ত।

সাধারণ শাড়ি, সাধারণ ব্লাউজ, কাঁধে ঝোলা। রিক্সা থেকে নেমে এমন করে মাথা নিচু করে আমাদের পায়ের ধুলো নিল যে, কি বলব! দেবী ওর চিবুকে আঙুল ছুঁয়ে স্নেহমাখানো ফ্লাইং চুমো দিল। আহা যদি তার অর্ধেকও আমার জন্যে করত। আমি মালতীর মুখের চেহারা দেখে চিনতে পারলাম। আঠারো-উনিশ বছর আগে আমিও এমন আশা নিয়ে কত জায়গায় ঘুরেছি। যদি কেউ কিছু করে দেয়। আমার পায়ে হাত ছুঁইয়ে মালতী এমন করে মাথায় বোলাল —যেন চাঁদের ধুলো।

ছুপুরে খেতে বসে ওর নতুন বরের কথা পাড়লাম। দেবী বললো, 'পাজি ছেলে। এখন বাবা-মায়ের স্নবোধ ছেলে হয়েছে।'

আমি মাছের মুড়ো কোনদিনই তাড়াতাড়ি খেতে পারি না। কলেজেরও সময় হয়ে এল। দেবী বুঝেছিল। ও বললো, 'ভেটকির মাথা—দাও না মালতীকে—'

আমি একটু ইতস্তত করছিলাম। মালতী নিজেই তুলে নিয়ে ধারালো ঝকঝকে দাঁতে সেটা কামড়ে ধরলো। তারপর ঝকঝকে টাটকা দাঁতে হাড়গুলি মুড়মুড় করে কয়েক চাপে ভেঙে ফেললো মালতী। আমার অবাক হওয়াটা ও চোখে হাসি তুলে এনে এনজয় করছিল।

সার আর আলুবীজ ব্যবসায়ী একজন দানসাগর তার বাবার নামে এই কলেজ করেন। অঢেল জায়গা। অপর্যাপ্ত ঘাস। আমাদের গরুটা মশ মশ করে খেতে খেতে সায়ান্স ল্যাবরেটারির দিকে এগোচ্ছিল। আমার ছায়া ওর গায়ে পড়তেই কৃতজ্ঞতাভরে চোখ তুলে তাকালো। সে কি দৃষ্টি! ঘন কালো চোখের ওপর-নীচে সুরমার চেয়েও কালো রঙের রেখা। কদম পাতার মতো

লম্বা দু'খানা কান চোখের খানিক ওপরে সোজা করে রেখে সূর্যের ঝাঁজ আড়াল করেছে। ওর মায়ায় দাঁড়িয়ে পড়ছিলাম প্রায়। চারদিকে গাছের ছায়া। আমার জীবন এখানে ওয়াল-ক্লকের ঘণ্টাধ্বনির মতোই নিয়মিত; অনায়াসে কেটে যায়।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের ছেলে দোতলার চিলেকোঠায় ছবি আঁকতে গেল। সঙ্গে দৈতরি। ঘরের ভেতর আলো জ্বালিয়ে বসে বাইরের অন্ধকার আঁকে ও। অর্থাৎ কালো রঙ-পেনসিলটা বড় তাড়াতাড়ি ফুরোয়। ওর বেশির ভাগ ছবিই—রাত্রি। পড়াশুনোর পর এই একটা খেলাই ওকে বেশ কাবু করে রাখে। কতদিন ভেবেছি—এক পাতা জুড়ে কালো পেনসিল ঘষে তৈরি অন্ধকারে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ও বোধহয় সারাটা রাত দেখতে পায়। কিংবা, আমাকে কি চিনতে পেরেছে!

আমি বিনি খয়েরের পান খাই। মালতী খাওয়া-দাওয়ার পর তাই একটা হাতে ধরিয়ে দিল। ছোট দানার সুগন্ধি এলাচ দাঁতে মাড়িয়ে ফেললাম। বাড়িটার ছায়ার বাইরেই জোৎস্না দাঁড়িয়ে ছিল। আমার চেনা ফুলগুলো অন্ধকারে যে যার মতো সুবাস ছড়িয়ে যাচ্ছে। এখন সবজি ক্ষেতে লাল টসটসে টমেটোগুলো ছায়ায় শিশিরে আরও পুরন্ত, আরও লাল হয়ে উঠেছে নিশ্চয়। এই সময়েই গাছপালা ফলফলাদি নিস্তব্ধ পৃথিবী থেকে নীরবে রস শুসে নেয়। আমি মালতীর দিকে তাকালাম। ওর এভাবে বেড়ে ওঠার কথা নয়। কত বাধা সামনে পড়ল। তবু টসকায়নি। এই সামান্য বয়সে তিনটি সন্তান—তাদের শোক। দুটি স্বামী—তারপরেও একটি কামান্ধ দেওর পার হয়ে আসতে হয়েছে মালতীকে।

কেকাধ্বনি শুনিনি কোনদিন। ব্যাপারটা মধুর না কর্কশ তাও জানি না। সম্রাট অশোক নাকি ওদের মাংস খেতেন। নেহরু কি তা জনেতেন? মালতী আমাদের কম্পাউণ্ডের বাইরেই দাঁড়ানো অল্পবয়সী শালগাছটা দেখিয়ে বললো, 'ওটা কতদিনের জগদীশদা—?'

অন্য যে কোনো রমণীই আমার পুরন্ত স্ত্রীকে ঈর্ষার চোখে তাকিয়ে

তাকিয়ে দেখে থাকে। এ আমি জানি। দেবী জানে কিনা—তা ওর ভাবসাব দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই। এমন একটি রমণীর মালিক হওয়া সত্ত্বেও আমি মালতীর গলা চিরে যাওয়া কথাগুলোর ধ্বনি অন্তত খানিকক্ষণের জন্যেও ধরে রাখতে চাইলাম।

'আমি তোর মামা হই না! দাদা ডাকছিস—'

হুহু করে অনেকটা চাপা হাসি অন্ধকার বারান্দার বাইরের জ্যোৎস্নায় ছিটিয়ে দিয়ে মালতী বললো, 'মা আপনাকে দাদা বলতো। তাই ডাকলাম। এমন টাটকা লোককে মামা ডাকা যায়!'

'তোর টাটকা লোকটি কবে আসবে বল তো—

মালতী চুপ করে গেল। লম্বা বেণীর শেষদিকটা চাবুকের স্টাইলে হাতের মধ্যে ধরে অন্ধকারেই তু'বার ঝাপটালো। এখানকার গাছপালা ও জানে না। এখনো চেনে না। বারান্দায় কাগজফুলের এলোমেলো কয়েকটা ডাল ঢুকে এসেছে কিচ্ছিমিছি। ওর বেণীর ঝটকায় কয়েকটা ফুল খসে পড়ল।

দেবী যেন সুখে ভাসছিল। বললো, 'হ্যারে মালতী, কেমন বিয়ে করলি বল তো? পুরুষলোক তোর না-চেনার কথা নয়। সুকুমার বিকেলেও এলো না—'

আমি আন্দাজে ধরতে পারছি, মালতী বিকেলে কুয়োতলায় চান করেছে। দেবী হরিতকী গাছের নীচে দৈতরির ঘরে গিয়ে বলেছে, 'মালী তিন বালতি জল তুলে দিওগো। নতুন মেয়ে। কিছু জানে না এখানকার—'

দৈতরি নিশ্চয় বলেছে, 'ও আমি দিব। তুমি ওধারে যাও—'

আমাদের বাগানে কত ফুল। মালতী নিশ্চয় তু'একটা বেণীতে লটকে নিয়ে থাকবে। এখন বারান্দায় পায়চারি করছে। সহজে ফুরোবার মেয়ে নয় সে; আবার জিজ্ঞেস করলো, 'গাছটা কতদিনের? বলতেন মা তো। আপনি লাগিয়েছেন?'

'না। আমরা এসে থেকে দেখছি—ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে।'

দেবী বলল, 'সুকুমার তোর সঙ্গে আজকাল দেখা করে না?'

'খুব কম।'

'একসঙ্গে বেড়াতে যাসনি কতদিন ?'

'অনেক দিন। এসব শুনে কি হবে মামীমা ?'

'বা! আমরা জানবো না ?'

'মায়ের কথায় বেহালায় বিয়ে বসলাম। ক'দিন সুখে ছিলাম। মামাবাড়ির যন্ত্রণায় মাকে ফেলে রেখে বেশ দিন যাচ্ছিল।'

'তাই তো জানতাম। তোকে নিয়ে ছবি তুলে একদিন আমাদের কলকাতার বাড়িতে এসেছিল বিনোদ।'

'তুমি অন্য কথা বলো মামীমা—'

আমিও মেলাতে পারছিলাম না। একটি রমণী—দু'টি স্মৃতি। অথচ জীবন একবারই খরচ করা যায়। একবারই ভাঙানো যায়। এসব কথায় কি হবে এখন।

'বেহালায় বিয়ে না বসে প্রথমবারেই সুকুমারকে বিয়ে করলে পারতিস—'

অদ্ভুত করে হেসে উঠলো মালতী, 'আহা! সবকিছু কত যেন আমার হাতেই ছিল!'

এই দু'জন মেয়েলোক কি জানে না—এখানে একজন তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত! সে পুরুষলোক। শ্রীজগদীশ রায়। তার স্মৃতি বলতে কিছুই পড়ে নেই। সবটাই এখন ধোঁয়াটে।

নিজে নিজেই মালতী বলে উঠলো, 'সুকুমারকে বলেছিলাম—অত চিরকুট পাঠিয়ে ভালবাসা না জানালেও চলবে। চল আমরা গিয়ে কালীঘাটে অন্তত মালাবদলটুকু সেরে রাখি। তারপর যেদিন ইচ্ছে একদিন বিয়ে করে নিলেই হবে। ওর সাহস ছিল না। লোভ ছিল—'

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি বুঝতে পেরে মালতী বললো, 'ওর বাবা বিয়ে করে যে জায়গাটুকু পেয়েছে—তাতে পাঁচ ইঞ্চি গাঁথুনির দোকানঘর, থাকার বাড়ি বানিয়েছে—হোক বস্তিতে—তবু তো কলকাতায়।' তারপর বেশ খানিকটা থেমে থেকেই বললো, 'ওর লোভ কাটিয়ে কি করে যে ওকে বিয়ে বসালাম—সে আমিই জানি।'

রাতে দেবী সব ভেঙে বললো। সুকুমার খুব হিসেবী ছেলে। মালতীকে সুকুমারের মা ঘরে নিতে রাজী নয়। তার মতে বড় ছেলে সুকুমার পরস্ত্রী বিয়ে করে কি করে? তার মনে ইচ্ছে ছিল, আনকোরা কচি বউ আনবে ছেলের। মেয়েটাই ডান। তার বোকা ছেলেকে তুক্ করেছে। এই অবস্থায় মালতী ও বাড়ি গিয়ে উঠলে ঝেঁটিয়ে তাড়াবে। তার ইচ্ছে ছেলের আবার বিয়ে দেয়।

সুকুমার নাকি আড়ালে-আবডালে মালতীকে পেলে এখনো চুমো খায়। ভালো ভালো কথা বলে। দেবী বললো, 'ছেলেটার কোন টান নেই। এখন মা-বাবার কাছে গিয়ে উঠেছে। মালতীটাই মরে শুধু—'

সুকুমার নাকি মালতীকে ভালো ভালো চিঠিও লেখে। স্বামীর কর্তব্য কি, স্ত্রীর কি করণীয়—এইসব। একখানা চিঠি মালতীর খোলা তোরঙ্গে দেবী দেখেছে। কিন্তু কিছুতেই মালতীর সঙ্গে এক জায়গায় থাকতে চায় না আর। বলেছে, চাকরি খুঁজছে। পেলেই বাসা দেখে মালতীকে নিয়ে যাবে। ততদিন কষ্ট করে ও যেন ওর পাতানো মামা-মামীর বাড়িতে কাটিয়ে দেয়।

'মালতীর ইচ্ছে তুমি ওদের জন্যে যা হোক কিছু একটা করে দাও। মালতী বলছিল, সুকুমারের চাকরি পাবার কোনো ভরসা নেই। বাজার কি কঠিন। জায়গাটা ওর ভালো লেগেছে। কলকাতার মতো জলের কষ্ট নেই। খোলামেলা। ওরা বেশ এখানে কাটিয়ে দিতে পারবে।'

'ছেলেটা এলে তো—'

'ঠিক এসে যাবে।'

'কি করে বুঝলে—'

'দৈতরি শনিবার দুপুরে শ্মশানে যাবে—একশো আটটা বেলপাতা নিয়ে—'

দেবীকে টেনে নিলাম, 'শেষকালে মন্তর—উচাটন!'

'দেখো না ঠিক এনে দেবে সুকুমারকে। ফুল্লশ্রীর পাড়ে দাঁড়িয়ে চাইলে সব পাওয়া যায়—'

হবেও বা। ফুল্লশ্রী এখানকার পুরনো নদী। খুব ছোট না। খুব বড় না। ডিঙি চলে। খেয়া আছে। মাছ ধরা যায়। তীরে শ্মশান আছে।

আমি ভাবলাম, মালতী এখন একা একা ঘরে ঘুমোচ্ছে কি করে। তিনটি সন্তান, দু'টি স্মৃতি, একটি দেওর। গোলাপ-আঁকা তোরঙ্গের ওপর মুখ দেখার আয়না বসিয়ে নিয়েছে এরই মধ্যে।

॥ দুই ॥

আরতিকে আমি দূর থেকে দেখলে ভেতরে কেঁপে যেতাম। এরই নাম কি শিহরণ? হবেও বা। আমি আর আরতি বেড়াতে গেছি অনেক জায়গায়। শীতের বেলা ন'টা দশটা হবে। দু'জনে মাঝেরহাটের ব্রিজের নিচে গিয়ে বসেছি। এখানে একটা খাল আছে—অনেকগুলো লাইন আছে—গুচ্ছের মালগাড়ি টেনে নিয়ে ইঞ্জিন যায়। তখনো নিউ আলিপুর হয়নি। যুদ্ধের বাতিল ট্যাঙ্ক সারি সারি সাজানো। মোষ চরে। কুকুর ঘুরে বেড়ায়। আমরা জন্তু-জানোয়ার কেয়ার করতাম না। চারদিক একটু ফাঁকা দেখলেই আরতি ভারি ভারি চুমো খেত। আমিও ইন্সপায়ার্ড হয়ে পড়তাম।

কিন্তু কতদূর এগোনো উচিত জানতাম না। আর বেশি এগোনোর পক্ষেও জায়গাটা তেমন নিভৃত ছিল না। দ্বিধা বলতে যা বোঝায় তাই ছিল। কেননা, আমি তো মনে মনে ছবি এঁকে বসে আছি—প্রেম একটি অখণ্ড আমসত্ত্ব। পাথরের বাটিতে পুরোপুরি ভিজিয়ে দই দিয়ে মেখে খেতে হয়। ও যে টেনে টেনে ছিঁড়ে নেবার—মাঝে-মধ্যে চেপে দেখার—পারলে টাকরায় আওয়াজ তুলতে হয়—এসব তখনো শিখিনি।

একদিন বেলা দশটায় ভিকটোরিয়ার মাঠে গিয়ে বসলাম। সিমেণ্টে বাঁধানো পুকুরগুলো শ্যাওলায় মজে যাওয়ার যোগাড়।

পাথরের সিংহ, মহারানী ইত্যাদি অটুট। বয়স্ক গাছের ছায়ায় শ্রুতকীর্তি ভাইসরয়রা পাথর হয়ে দাঁড়ানো। আমি আরতির হাত ধরে বললাম, 'এভাবে ঘুরে বেড়িয়ে লাভ কি। তার চেয়ে এসো না আমরা তৈরি হই—'

'মানে ?'

আমার খুব লজ্জা হচ্ছিল। তবু বললাম, 'কাজকম্ম যোগাড় করে বিয়ে বসি।'

'ধ্যাৎ! এখুনি নয়।'

আমি ভেতরে ভেতরে কেঁপে গেলাম। তখনই মনে হলো, আগে কত ভালো ছিল। যার যাকে পছন্দ—দিব্যি কেড়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করত। ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোন প্রশ্নই ছিল না।

এ কিরকম ভালোবাসা। সাঁতার কেটে জল দেখে তবে ডুব। আমার মন খারাপ হয়ে গেল। কিছুদিন আমরা এদিক-ওদিক ঘুরলাম। কিন্তু মন বসে না আরতির। বোঝাই যায়। শুধু চুমু খাওয়ার সময় কিছু উত্তেজিত। এই পর্যন্ত।

আমিও কোনো মানে পাই না। কলকাতায় মিছিল যায়। গুলি চলে। পরিকল্পনার কথা শোনা যায়। নতুন স্বাধীন দেশে নানা দেশের প্রতিনিধিরা আসে। পরদিনের কাগজে তাদের ছবি দেখে শুভাগমন জানতে পারি। আর আমি শুধু প্রেম করে বেড়াই! সাদার্ন অ্যাভিন্যুর ঘাসে সন্ধ্যের নিওন আলোয় নিরুদ্বেগ যুবকরা গোল হয়ে আড্ডা দেয়। অনুরোধের আসরে গত রাতে কোন্ গানখানা ভালো লেগেছে—তাই নিয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্তা। এখন ভাবি পৃথিবী কত সোজা ছিল তখন। কিংবা তখনো কঠিন ছিল। আমি জানতাম না।

আস্তে আস্তে আরতি সরে যাচ্ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম। কিছু করার ছিল না। জোর করে গলা জড়িয়ে ধরে তো আর বলা যায় না: ওগো আমায় ভালোবাসো—আমায় ভালোবাসো। আমি রোজ বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছিলাম! ভালোবাসার যন্ত্রণা কোথায় তার আঁচ পাচ্ছিলাম একটু একটু করে। আসলে আরতি নামক মেয়েটিকে

সবখানি পাবার একটা প্রবল ইচ্ছেয় আমি ডুবে যাচ্ছিলাম। আরতি ক্রমেই সরে যাচ্ছিল।

তখন আমি জানতে পেরেছি, ড্রাগিস্ট সন্তানের বলশালী সান্নিধ্যে আরতি তলিয়ে যাচ্ছে। আমি কানাঘুষো কিছু কিছু শুনছিলাম। কিন্তু আরতির সঙ্গে আমার এমন কোনো বন্ধন ছিল না যার জোরে আমি বলতে পারি—আমার কাছে ফিরে এসো। আমার এই ডাকে কোনো দীপ্তি ছিল না। মনে মনে গুণগুণ করে বলা যেত শুধু। যার নাম নীরব প্রার্থনা।

তবু শেষ চেষ্টার মতো আরতিকে নিয়ে একদিন গড়ের মাঠে চলে গেলাম। চৈত্রের বিকেল। কালবৈশাখীর ঝড় ওঠে রোজ বিকেলে। সেদিনও উঠল। ট্রামলাইনে কাগজের টুকরো, শুকনো পাতা, মরা ঘাসের গুঁড়ো হাওয়ার সঙ্গে ওপরে উঠে পাক খেতে লাগল। সারাদিনের তাতানো শহর কেমন অন্ধকার হয়ে গেল। আমরা বসেছিলাম একটা ক্লাবের কাছাকাছি। সেখানে সুবেশ লোকজনের ভিড়—এখানে-সেখানে দু-চারটি ভালো চেহারার মেয়ে। ওরা তাকাচ্ছিল আমাদের দিকে।

তাই বোধহয় আরতির অস্বস্তি লাগছিল। উঠি-উঠি করছিল।

'বলো, ডেকেছ কেন ?'

আমি অভিমানে মরে গেলাম। মুখে কথা এল না।

'তাড়াতাড়ি বলো। উঠব। ঝড় আসছে।'

সত্যি আসছিল। কিন্তু আমি যেন না বলে পারলাম না, 'আরেকটু বোসো না। এই তো এলে—'

'নাঃ। কি বলবে বলো। তাড়াতাড়ি বলো।'

এসপ্ল্যানেডের আকাশ মেঘ একেবারে থাবা মেলে অন্ধকার করে দিল। 'তোমার কিছু বলার নেই ?' বলতে বলতে আমি অন্যমনস্ক হয়ে ওর পায়ের একটা কড়ে আঙুলে আঙুল রেখেছি। এত ছোট্ট জিনিস। কত নিষ্ঠুর।

'ওকি। পায়ে হাত দিচ্ছ কেন ?'

'এমনি। সুন্দর লাগল তাই।'

পা সরিয়ে নিল আরতি, 'আমি উঠব এবারে। এরপরে আর ট্রাম পাওয়া যাবে না।'

'ঝড় থেমে গেলে অনেক ট্রাম বেরোবে—'

'তুমি বসে থাক। আমি চললাম।'

সত্যি সত্যি উঠে দাঁড়ালো আরতি। হাওয়ায় ওর শাড়ির আঁচল উল্টোদিকে পত পত করে উড়ছিল। আমি বসেই থাকলাম। ও আস্তে আস্তে দূরে সরে যেতে লাগলো। ট্রাম লাইন পার হয়ে একটা ট্রামেও উঠে গেল। ট্রামটা চলে গেল।

আমি উঠতে পারছিলাম না। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল—আমার অনেকখানি চারদিকে আপনা-আপনি খুলে পড়ে ছড়িয়ে গেছে। সেসব কুড়িয়ে নিয়ে জোড়া দিলে তবে আমি উঠে দাঁড়াতে পারি। কিন্তু কুড়িয়ে নেওয়ার কোনো শক্তি নেই আমার। ইচ্ছেই যেন নেই। অনেক কথাই আজ আমার বলার ছিল—আরতি, তুমি তবে কেন আমায় ভালোবাসতে দিলে। আমি তো আগে কোনদিন কাউকে এমনভাবে বাসিনি। যদি ভালোবাসা দিলে তবে কেন ফিরে তুলে নিলে। কি দরকার ছিল। আমি তো আজ তোমায় কোনো কথাই বলতে পারিনি। আমি জানতাম তুমি কোনো কথাই শুনতে আসনি।

বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি এসে গেল। ফাঁক ফাঁক হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। আমি তিন-চারটে ফোঁটার ফাঁকে বসে দেখলাম বৃষ্টির দানা আমার বাইরে গিয়ে পড়ছে। কিন্তু এভাবে বেশিক্ষণ বসা যায় না। জানতাম, এ হলো বৃষ্টির মায়া। আসল বৃষ্টি নয়। খানিক বাদেই থেমে যাবে। ইচ্ছে করলেই উঠে গিয়ে গাছের নিচে দাঁড়ানো যেতো। গেলাম না। যাওয়া গেল না। আমি আমাকে কিছুতেই গুছিয়ে উঠতে পারছিলাম না। কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াব, এমন কোনো জোর আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

আমার ওপর দিয়ে আধঘণ্টার একটা বৃষ্টি চলে গেল। ততক্ষণে আমি ভিজে একশা। সার্টের বুকপকেটটা এরই ভেতর হাওয়া পেয়ে

ফুলকো লুচির স্টাইলে ফুলে উঠতে চাইছিল। বৃষ্টি থামতেই ক্লাবঘরের লোকজন বেরিয়ে এসে প্রথমেই দ্রষ্টব্য হিসেবে পেল আমাকে। জোড়ায় ছিলাম। এখন একা। তারা আমাকে মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। আমি দৃষ্টির খোঁচায় উঠে দাঁড়ালাম।

জানতাম সেই আমার আরতির সঙ্গে শেষ দেখা। শেষ কথা।

তারপর বিশ-বাইশ বছরে জগদীশ রায় একজন পাকাপোক্ত লোক হয়ে উঠেছে। আঠারো-উনিশ বছরের ছেলেরা কেউ কেউ তাকে কাকাবাবু ডাকে। এখন পথে বেরোনোর সময় তার সঙ্গে থাকে কলম, চাবি, রুমাল, মানিব্যাগ, মাস্থলি। সে এখন রীতিমতো সশস্ত্র ও সুসজ্জিত গৃহস্থ।

মোটামুটি এর পরেও আরতিকে সে বার তিনেক দেখেছে। একবার চলন্ত ট্যাক্সিতে বসে গড়িয়াহাট দিয়ে যেতে যেতে দেখেছিল, স্কুলের দিদিমণির পোশাকে আরতি একটা ভিড়ের বাসে উঠছে। হাতে খাতার বাণ্ডিল।

ইতিপূর্বে একদিন বেশ কয়েক বছরের গ্যাপে দু'জনে মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল। ড্রাগিস্ট সন্তান তখন বিয়ে-থা করে ঘোর সংসারী। অথচ আরতির আইবুড়োমি ঘোচেনি। এমন মেয়ে না যে, আদর্শ কিংবা রিসার্চ ইত্যাদির জন্যে বিয়ে ঠেকিয়ে দূরে সরিয়ে রেখেছে। আসলে বিয়েই ওর জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা হয়ে ওঠার কথা। দেখলাম সেটাই হয়নি।

তখনো আমার বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠেছিল। ও খুব হাসিমুখে কথা বলার জন্যে ফুটপাথের ভিড় ভেঙে এগিয়ে এল। আমি একটা কথাও বলতে পারলাম না। কতদিনের অভ্যেস নেই। অনেক-কিছু জানতে চেয়েছিল। যেমনঃ আমার বোন কোথায়? এখন কোথায় থাকি? কি করি? ইত্যাদি—

আমি শুধু বললাম, 'বছর দুই হলো বিয়ে করেছি—'

ওরকম ভিড়ের ফুটপাথে দাঁড়িয়েই জানতে চাইলো, 'বউ খুব ফরশা—!'

আমি থতমত খেয়ে গেলাম। ওই পর্যন্ত।

তারপর আরও অনেক বছর পরে—গড়িয়াহাটা দিয়ে চব্বিশ নম্বর ট্রামে প্রফেসর ঘোষের মেয়ের জন্মদিনে প্রেজেণ্টেশন দিয়ে ফিরছি—দেখি, আরতি বেশ কয়েকজন ভারি ভারি মহিলার সঙ্গে রাস্তা পার হয়ে একটা বেশ বিখ্যাত মিষ্টির দোকানে ঢুকছে, বলা নেই কওয়া নেই, আমিও সেই মিষ্টির দোকানে ঢুকলাম। উল্টোদিকের বড় আয়নায় আমাদের জোড়া ছায়া। আরতি আমাকে দেখল। আমি দেখলাম। ও চিনল না। এতদিনে আইবুড়োমি ঘুচেছে। নতুন বিয়ের পর কয়েকজন ভারি ভারি ননদ নিয়ে মারকেটিং-এ বেরিয়েছে। তাই মনে হলো। হাতে অনেক রকমের প্যাকেট।

শীতের দুপুর। আমি আর কি করি। সেই শেষ দেখা। আমি দু'টাকার মুগের লাড্ডু কিনে মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। কয়েকটা খেলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ভিখিরি ছিল কাছেই বিলি করে দিয়ে বাসে উঠলাম।

এর নাম প্রেম। এর নাম ভালোবাসা। অথচ এই আরতির জন্যে আমি উনত্রিশ দিন না খেয়ে ছিলাম। এখন ব্যাপারটা কিছুই না। পাবলিক হয়তো বলবে, এ আর এমন কি নতুন কথা। ঠিকই। কিন্তু সব সত্যি কথাই পৃথিবীতে পুরনো।

এখন দেখা যাচ্ছে, সকালবেলাও ঘুম পায়। সারারাত ঘুমোনোর পরেও এমন অবস্থা হয় মাঝে মাঝে। চারদিকে রুটিনের মতো নানান বকেয়া কাজ আমার দিকে হা করে তাকিয়ে আছে। আমার উপায় নেই। একসময় যে একটু চোখ বুজে পড়ে থাকব—দুটো নিজের কথা ভাবব—কিংবা, কিছুই ভাবব না, সে উপায় নেই। অলওয়েজ সামনের স্টেশনটাকে মনোহারী লাগে। সেখানে পৌঁছে মনে হবেই—ও হরি! এই—

ইংরেজি নাটকের ক্লাসে ফার্স্ট বেঞ্চে তিনটি মেয়ে অপলকে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি তখন পাগলা ঘোড়া হয়ে ছুটি। ক'জন সেক্সপীয়র ছিলেন, নাটকের আদত গল্পটা কোত্থেকে

পাওয়া—এসব নিয়ে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য বিস্তার করি। ওরা নোট নেয়। কিংবা আমার মুখমণ্ডলে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। হয়তো আমাকে নার্ভাস করে দেওয়ার জন্যেই অমন সরাসরি তাকায়। সম্পর্ক বড় শ্রদ্ধার। কিন্তু আসলে তো আমরা মানুষ-মানুষী। ফলে যা হবার হবেই। ভদ্রলোক হিসেবে জগদীশ রায় তখন শুধুই পড়াশুনোর কথা বলে যায়। মেয়ে তিনটির মুখ তাকে কোনো দাগ কেটেছে বলে বোঝার উপায় থাকে না।

আরতির জন্যে কলকাতার নির্জন-নির্জন রাস্তাগুলো চিনেছিলাম। দুপুরে আলিপুরে ঘুঘু ডাকে—একথা কি আগে জানতাম। তেমন কান কি আগে ছিল। বড় বড় আমগাছ খাঁ খাঁ দুপুরে রাস্তায়, ফুটপাথে ছায়া ফেলে গ্রামের মাঠের মতোই স্নিগ্ধ করে রাখত। জগদীশ সেখানে কলকাতার অন্য মানে খুঁজে পায়।

অপলকে মনীষাও তাকাতো। সে তাকানো অন্যরকম। তার চোখে মেঘের ছায়া স্থির হয়ে থাকতো। ডান চোখে একটা শিরা ফুলে গাছের পাতার ভেতরকার মতোই বেঁকে কোণের দিকে চলে গিয়ে থেমে থাকতো। চশমা খুলে তাকালে জগদীশ আর স্থির থাকতে পারত না। সে সব অন্যকথা। সেকথা এখন আমার কাছে অন্যের কাহিনী।

॥ তিন ॥

শনিবার কলেজে বেরোনোর আগেই দেবী আর মালতী দৈতরির সঙ্গে একডালা বেলপাতা নিয়ে খোলা চুলে ফুল্লশ্রীর দিকে চলে গেল। আমি ছাতে উঠে মুরগীগুলোর জলে এ. আর. ডি. ভিটামিনের গুঁড়ো মিশিয়ে দিলাম। কয়েকটার মাথার ঝুঁটি খুব লাল হয়ে উঠেছে। ক' দিনেই ডিম দেবে। হরীতকীতলা থেকে দু'টো চড়াই উড়ে এসে আমাদের শোয়ার ঘরে আয়নার সামনে বসলো। তারপর আয়নায় দেখা চড়াইয়ের খোঁজে ওরা সারা বাড়ি পাক খেতে লাগলো।

আমার যোগ্যতা নিয়ে কত লোক রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়। আগে এসেছিলাম বলে এমন নিশ্চিন্তে আছি। দেড়টা নাগাদ কলেজ ছুটি হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে দেখি—ওরা তখনো ফেরেনি। বারান্দায় বসে বসে একা একা কফি বানালাম। খেলাম। বয়াম খুঁজে খুঁজে এটা-সেটা চেখে দেখলাম। হোক না নিজের কোয়ার্টার। তবু খালি। বাড়ি ফাঁকা হলেই আমার একা একা কোনো-না-কোনো অন্যায় কাজ করতে ইচ্ছে করে। খুব ইচ্ছে করে। কিছুই পাই না। কি করি। দড়ি খুলে বালতিটা কুয়োয় ফেলে দিলাম।

হিসেব করে দেখছিলাম আমি ভদ্দরলোক হয়েছি কতদিন। হোস্টেলে ছেলে কমে গেছে। কলেজের পথ ফাঁকা। কি সুন্দর সময়। এখন এই নির্জন পথ ধরে ধরে লাইটপোস্টে উঠে যাওয়া শুধু। তারপর এক এক প্যাঁচে প্রতিটি ডুম খুলে নেওয়া।

কুয়োতলায় একটা অচেনা লোক ঘোরাফেরা করছিল। ভালো তো! জলজ্যান্ত আমি বসে আছি। আমাকে না বলে আমাদের চত্বরে ঢুকে ঘোরাফেরা।

'অ্যাই—'

লোকটা হাত তুলে বললো, 'যাচ্ছি—', চোখ কিন্তু মাটির দিকে। কি খুঁজছে। আমাকে আমলই দিল না। অগত্যা বসে আছি। মিনিটখানেক পরে লোকটা এল।

'এ কি?' আমি ইজিচেয়ারে পা তুলে ফেলেছি। লোকটার হাতে একটা জ্যান্ত সাপ। লেজ উঁচু করে ধরেছে বলে মাটি থেকে ফণা বেশি তুলতেই পারছে না।

'হরতুকি গাছের গোড়ায় সংসার পেতেছে বাবু। গন্ধ পাচ্ছিলাম—', লোকটা আমারই বারান্দার নীচে ঝাঁপি রেখেছিল গোটা দুই। তার একটাতে ভরে ফেলে বললো, 'আরো আছে—'

'ধরে ফেল।'

'এখন আর পাওয়া যাবে না। খবর হয়ে গেছে—'

'তুমি জানতে এখানে সাপ ছিল?'

'আপনি কলেজে চলে যান। মা ঘুমিয়ে থাকেন। খোকাবাবু স্কুলে যান। দৈতরি আমায় চেনে বাবু—'

'কি নাম তোমার—'

'আশু বৈদ্য। পাঁশকুড়ার লোক আমরা। সাপ ধরে বেড়াই। বিষ বিক্রি করি। তেমন তেমন গোসাপের চামড়াও এসে যায় হাতে— বলেন তো দিয়ে যাই—'

'আমার দরকার নেই। তুমি ধরলে কি করে? কামড়ায় না?'

'ওষুধ আছে', বলে আশু আমার পায়ের কাছেই নীচের ঝাঁপিটার ডালা খুলে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে একটা কালো সাপ মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো।

'সরাও সরাও', বলে চেঁচাচ্ছি। লোকটা শুনলো না। ফণার ওপর হাত রাখতেই মাথা নামিয়ে নিতে লাগলো, 'হাতে ওষুধ আছে বাবু। আপনিও রাখুন না!'

'সরাও বলছি।'

আশু হেসে উঠলো, 'বেনাপুলি মদ্দ কেউটে বাবু। রাগ করবেন না। ফুল্লশ্রীর ধারে ধরেছি।'

বলতে বলতে আশু আমার ডান হাতখানা টেনে ধরে মুঠোয় কি গুঁজে দিল। তারপর এক রকম জোর করেই বদরাগী সাপটার মাথায় আমার হাতখানা চাপিয়ে দিয়ে নিজের হাত সরিয়ে নিল।

আমার হাত ঝুলে পড়েছিল। ভয়ে। তার ওজন ছিল। সে ভার অতটুকু ফণায় বইবার কথা নয়। তাই ও ক্রমেই ফণা নামিয়ে নিচ্ছিল। আমার আঙুলের আঙটিতে ওর মাথা ঘষা খাচ্ছিল। তবু কোনো আপত্তি না করে বেনাপুলির সিধে ফণা শুধুই নেমে যাচ্ছিল। আমার হাতের আঙুলে তেলতেলে মাথাটা স্লিপ খাচ্ছিল শুধু।

আশু বৈদ্য তখন কলেজ মাঠের গোলপোস্টের কাছে চলে গেছে। সেখান থেকে দাঁড়িয়ে খুব ধীরে-সুস্থে বললো, 'একটা ফল মাদুলি করে দিয়ে যাচ্ছি বাবু। কাছে রেখে দেবেন। দশটা টাকা এখন হবে আপনার কাছে?'

একশো বললেও বলতাম আছে। মাথা নাড়লাম।

'এখন দিতে কোনো অসুবিধে হবে না আপনার?'

'কিচ্ছু না। তুমি বাবা তাড়াতাড়ি এসে ইটিকে ঝাঁপিতে রাখো। আর পাচ্ছিনে আশু। এরপর জ্ঞান হারাবো কিন্তু—'

ঝাঁপিতে ভরে আশু আমার পায়ের কাছে বসলো। পকেট থেকে নানান ফল বের করে একটি বেছে নিল, 'এ হলো গিয়ে আপনার শিবলিঙ্গ ফল। যা চাইবেন তাই দেবে। মাদুলি করে দিয়ে যাচ্ছি।'

'বেয়াড়া লোক সিধে করে দিতে পারো?'

'হবে। তবে আরও জিনিস চাই।'

'কেমন?'

'সাপের মাথার মণি—'

থামিয়ে দিলাম আশুকে, 'সাপের মাথার মণি হয় নাকি! গাঁজাখুরি!'

'না বাবু, হয়। বড় কষ্ট লাগে যোগাড় করতে। কালেভদ্রে একটা-আধটা মেলে।'

এ সব অবিশ্বাস না করার কোনো কারণ নেই। তবু বিশ্বাস করতে ভালোই লাগছিল। রূপকথায় এ সবের ছড়াছড়ি থাকে।

'আরো একটা জিনিস চাই। শঙ্খের কাপড়—'

তাকিয়ে আছি দেখে আশু বললো, 'কালনাগিনী নাগের সঙ্গে শঙ্খ লাগলে কাছেই কাপড় মেলে রাখতে হয়। ওনারা জড়াজড়ি করে গড়াগড়ি খেয়ে ওর ওপর এসে পড়লে বস্ত্রটুকু পবিত্র হয়ে যায় বাবু। খুব কাজের জিনিস। তক্ষুনি তুলে রাখতে হয়।'

আশু মাথা নিচু করে কি সব শেকড় চাকুতে কাটছিল। একটা তুলে ধরে বললো, 'এ হলো গিয়ে শিবলিঙ্গ—'

চোখ কাছে নিয়ে দেখলাম, সত্যি তাই। তবে ছ' কোণা শিরতোলা পেনসিলের মতো। আশু বললো, 'বউবাজারে বটকেষ্টর দোকানেও পাবেন। ছ' টাকা বাষট্টি পয়সা দাম—'

আরও অনেক জিনিসের দাম জানলাম। অমাবস্যার রাতে

উপোস করে তুলে আনা একাঙ্গীর মূল, লজ্জাবতী লতার শেকড়—এসব নাকি আকাশের বজ্রের ঝুঁটি ধরে নামাতে পারে। আশু চোখ ছোট করে বললো, 'গুপ্ত কাজে খুব কাজ দেয় বাবু। বাঁকা জিনিস এক লহমায় সিধে করে দেবে।'

আমার খুব হাসি পাচ্ছিল। আশু বললো, 'দূরস্থানের বিরুদ্ধ ক্লাসের লোকজন ডেকে এনে খাওয়ান। তারপর এক সময় শঙ্খলাগা বস্ত্রের ওপর বসতে দিন। সেই লোক আপনার বশংবদ হয়ে উঠবে।'

বললাম, 'গোটা দুই সাপের মাথার মণি চাই আর তিনখানা এই বস্ত্র বাপু। অবিশ্যি অবিশ্যি আনবে—।' মনে মনে হিসেব করছিলাম—সুকুমার, ওর বাবা আর মা—তিনজনের জন্যে তিনখানা শঙ্খলাগা বস্ত্র আর সাপের মাথার মণি দু'টো দিয়ে দেবীকে একটা আংটি বানিয়ে দেবো। ওই আঙটি দিয়ে আমাকে চিরকাল সিধে করে রাখবে।

যাবার সময় আশু একখানা দশ টাকার নোট খসিয়ে দিয়ে চলে গেল। মণির দাম বাইশ টাকা করে। শঙ্খবস্ত্রের জন্যে লাগবে তের টাকা বারো আনা করে। এ সব টাকা আমার সব সময় রেডি রাখা চাই। জানতে চেয়েছিলাম, 'আশু, ওটা আবার তের টাকার ওপর বারো আনা কেন?'

চোখ মুছে বললো, 'ও রকম হয়—'

ঘাঁটালাম না। বুঝলাম, জুতোর দামের মতো। বাইশ টাকা সাতানব্বই + সেল্‌ট্যাকস। ওই খুচরোটুকু হলো খদ্দের ভোলানো প্যাঁচ। যেন কত হিসেব করে টানাটানি করে বাইশ টাকার ওপর সাতানব্বই পয়সা স্থির করা হয়েছে।

আশু চলে যেতে ছাদে উঠলাম। ডিপলিটারের ব্ল্যাক মিনরকা মুরগীরা চলেফিরে বেড়াচ্ছে। দু' জন আমাকে চেনে। দেখে এগিয়ে এল। বেশী চলাফেরা করলে পেশী শক্ত হয়, ডিম কমে যায়—সেজন্যে মাথা পিছু দু' বর্গ ফুটের বেশি জায়গা রাখিনি। ভূমধ্যসাগরের কোনো দ্বীপের নামে ওদের নাম। ভারি ইচ্ছে হয় খাঁচা খুলে আজ ওদের উড়িয়ে দিই। মুশকিল, ওরা উড়তে ভুলে গেছে।

খাবারের সরায় দৈতরি কিছু পাথরকুচি ছড়িয়ে রেখেছে। ওগুলো মুরগীদের পেটে গিয়ে অন্য সব খাবার পেশাই করে দেয়। এত নিয়ম এত হিসেব—তারপরে ডিম। ছাদ থেকেই দেখলাম ফুল্লশ্রী থেকে দেবীর সঙ্গে মালতী ফিরছে। কপালে গোল আলু সাইজের সিঁদুরের টিপ। মালতীর সিঁথি চিরে লালের ছড়াছড়ি। দৈতরি বেচারাও একটিপ সিঁদুর পরেছে। মুখে বোধ হয় পানের সঙ্গে প্যাঁড়া পড়েছে। পানটা তাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খাচ্ছে। ফলে সারা মুখ জুড়ে একটি লালচে হাসি। এই তিনজন আমার চারপাশে থাকে, আমাকে ঘিরে ওরা বেড়ে উঠছে।

দৈতরি বললো, 'তিন দিনের মধ্যে দিদিমণির বাবু ফিরবে। দেখে নিও বাবু—।' শেষের বাবুটি আমি।

মালতী সে সবে কান দিল না। পরম কৃতজ্ঞতাভরে আমার চোখে চোখ রেখে বললো, 'চা খাবেন? বলুন তো জল বসাই—'

দেবী হেসে উঠলো, 'আমাদের বুঝি চায়ের তেষ্টা পেতে নেই রে!'

'ও মা। তাই বলেছি বুঝি! মামীমা, তুমি কিন্তু বড় ঝগড়ুটে—'

পথে চিনেবাদাম কিনেছিল ওরা। চায়ের সঙ্গে মালতী একটা একটা করে ভেঙে পিরিচে রাখছিল। আমি তুলে তুলে নিচ্ছিলাম। দেবীও নিচ্ছিল। তবে ও বড় সাবধানী। পাছে মুখে ফেলার সময় টাকরা চোখে পড়ে, তাই এক রকমের অদ্ভুত মুখ করে—প্রায় পাখির মতো ছড়ানো বাদাম খুঁটে খুঁটে মুখে তুলে নিচ্ছিল।

রঘু খানিক পরেই স্কুল থেকে ফিরবে।

দেবী বললো, 'ওদের দু'জনকে দিয়ে কিছু একটা করে দেওয়া যায় না? তুমি কিছু ভেবেছ?'

আমি কিছুই ভাবিনি। তবে জানি, সুকুমারের যা পড়াশুনো তাতে ওকে কোথাও ঢোকানো অসম্ভব। আজকাল লেদের ব্যবসা খরচের—আর আগের মতো তেমন চলেও না। এ সব আমার শোনা কথা। বাংলার লোকশিল্প বলে যে সব হাতের কাজের কথা শুনি, তাদের দুরবস্থা কে না জানে। নইলে অত ছবি ছাপাছাপি কেন।

বললাম, 'আর কিছু মুরগী নিয়ে ওরা বসতে পারে। স্বামী-স্ত্রীতে দেখবে। ডিম দিয়ে আসবে বাজারের হোটেলে। নয়ত আমাদের হোস্টেলও নিতে পারে।'

'দি আইডিয়া। পারবি মালতী?'

'খুউব। ও এলেই আমি বলে রাজী করাবো—'

এমন পাজি ছেলেটা। এখন আসে কি না ত্যাখ্—'

চট করে বলে ফেললাম, 'আমি এনে দিতে পারি।'

'কি রকম?'

আশু, শিবলিঙ্গ ফল, সাপের ফণায় হাত রেখেছিলাম—সব বললাম। দেবী লাফিয়ে উঠলো, 'হাতে সাবান দিয়েছ?'

দিইনি। তবু বললাম, 'দিয়েছি।'

আমি তো জানি সাপও একটা প্রাণী। সে তো বিষ মেখে ঘুরে বেড়ায় না। বিষ থাকে ওদের দাঁতে। যেমন থাকে আমাদেরও। কখনো জিভে।

পরদিন আশু আবার হাজির। চারখানা মাতুলি হলো। চারটি শিবলিঙ্গ ফল ভরে দিল মাতুলির ভেতর। তু' টাকা বাষট্টি পয়সা করে দাম। তার সঙ্গে যার যা ইচ্ছে দিতে পারেন বলে আশু হাত পাতলো। সবার হয়ে আমি দিলাম। যাবার সময় আশু কথা দিয়ে গেল, সাপের মাথার মণি আর শঙ্খলাগা বস্ত্র আমার জন্যে আনবেই। সে সময় দেবী বা মালতী কেউ সামনে ছিল না। ছোটবেলায় পঞ্জিকায় ৩০১ নম্বর রুমালের কথা পড়েছি। বিজ্ঞাপনে লেখা থাকত: যাতুই রুমাল।

পরদিন চান করে মালতী বাঁ হাতে মাতুলি নিল। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার।

শুক্রবার সকালে বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছি। বেলায় ক্লাস।

পুরনো আমলের কলার তোলা কোট গায়ে একটি ছেলে আসছিল পথ দিয়ে। গোঁফ আছে। মাথার চুলে ঢেউ। আমি সিওর হয়ে

গেলাম—এ নিশ্চয়ই সুকুমার। এই স্টাইলের ছেলেরা জীবনে দু' একবার কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে সিনেমায় নামার চেষ্টা করে ঠকে।

মালতীও দেখতে পেয়েছিল। ছুটে এল। আমি আর দেবী ভেতরে চলে গেলাম! ওরা খানিকক্ষণ একা একা থাকুক। এ রকম আমরাও ছিলাম। তবে আমরা বোধহয় অন্য রকম ছিলাম। কেননা, আমাদের জন্যে কেউ তো আর জীবনে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিল না।

সুকুমার বাড়ির ভেতরে এসে আমাদের একটা করে প্রণাম ঠুকলো। আশীর্বাদ করার সময় চেহারাটা দেখলাম। খড়ি ওঠা। মনে মনে বলি, কি দেখে বিয়ে করেছিলি মালতী! চুলের ঢেউ ভালো করে দেখলাম এবারে। নির্জন দীঘিতে এলো বাতাসে মৃণাল বোধ হয় এমন ঢলে পড়ে থাকে। চোখ বিষণ্ণ, গম্ভীর, কিছু হলুদ।

ঘরের ভেতর গিয়ে দেবী আমায় একা পেয়ে বললো, 'কিসের টানে সুকুমার এল বলো তো!'

'নিশ্চয়ই তোমার বিল্বপত্রের জোরে—'

'না গো মশাই। তোমার কবচ—থুড়ি মাদুলি টেনে এনেছে সুকুমারকে।'

তাও তো এখনো সাপের মাথার মণি, শঙ্খলাগা বস্ত্রের কথা বলিনি দেবীকে।

পরদিন প্রোফেসরদের রুমে সাপের মাথার মণির কথা তুলে খুব নাজেহাল হলাম। আগুর কথা আর ভেঙে বলিনি। প্রাণিবিদ্যার প্রোঃ দত্ত বললেন, মণি নয়, এঁটুলি। প্রাণিজগতে নানান প্রাণীর নানান সিমটম আছে। তারই একটা। সাপুড়ে, ওঝা ওরা এঁটুলিকে মণি বলে চালায়। পয়সা কামানোর ফিকির।

মা বেঁচে থাকতে তাঁর নানান ব্রতের জন্যে পঞ্জিকা লাগতো। আমরা পাতা ওলটাতাম। কোনো কোনো পাতায় আস্ত একটা বাঁধাকপির ছবি থাকতো—কোনো পাতায় বারো টাকায় ওয়াল-ক্লকের বিজ্ঞাপন। একটা পাতায় লেখা ছিল ঃ ৩০১ নং রুমাল সংগ্রহ করুন।

আপনার বাঞ্ছিত জনকে বশে আনুন। শত্রুকে কাবু করুন। মাত্র আট টাকা পাঁচ আনা। পনেরো দিনের ভেতর নির্দেশ সহ ডেলিভারি। বক্স নং ৭০২। জলন্ধর সিটি।

যতদিন বেঁচে আছি তার ভেতর বারো আনা সময় শুধুই শত্রুর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তখন কত লোক দেখতাম—তারা কত নিরাপদে আরামে থাকে। আমার যে কি কপাল!

এখন আমার সামনে তিনটি কর্তব্য। সুকুমারকে স্বাস্থ্যবান বানানো। ওদের জন্যে মুরগী আনা। তাদের ছ' মাসে বড় করে ঝুড়ি ঝুড়ি ডিমের ব্যবস্থা করে ফেলা। সেদিনই রাতে স্বপ্ন দেখলাম, আমি ডিম-স্পেশ্যাল মালগাড়ি নিয়ে স্টার্ট দিচ্ছি। ইঞ্জিনের হুইসেল দিতে যাব, সুকুমার বললো, 'মামাবাবু, সাবধানে চালাবেন—আশি কোটি ডিম রয়েছে—জোরে চালালে সব পোচ হয়ে যাবে।'

ভোরে সুকুমার চায়ের সময় এসে হাজির। ও ডিমে রাজী। ভালো রে হরিদাস পাল! টাকা পয়সা আমি টানবো। আর তুমি শুধু রাজী হয়ে খালাস। মুরগীর খরচ, তাদের ছ' মাস টানতে হবে—পাশাপাশি তোমাকেও টানতে হবে। চমৎকার! আমি যে শালা ভারত সরকার হয়ে যাচ্ছি!

গাড়িভাড়া, সিগারেট, জামাকাপড়, মুরগীর বাচ্চাদের জন্যে ব্রুডার বক্স—কত কি! সব কিছু টাকা আমি যোগাতে লাগলাম। হায়ার সেকেণ্ডারির এগজামিনার ছিলাম। পার্ট টু-এর এগজামিনার হয়েছি এ বছর থেকে। আমাদের ছেলে মজা পেয়ে গেল এক গাদা মুরগী ছানা দেখে। ব্রুডার বক্সের ভেতরে ছানাগুলো নড়ে-চড়ে। দানা খায়। ও দেখে। হাততালি দিয়ে ওঠে।

আমারও তো বেশ লাগে। বই কিনে নিয়ে এল সুকুমার কয়েকখানা। আধুনিক পোলট্রি ফার্মিং, পারিবারিক পোলট্রি—আরও কত কি। আমি যেন অনেক দিন পরে কিছু একটা করার মতো পেয়ে গেলাম। মালতীরও খুব উৎসাহ কাজে। জানলার গ্রিলগুলো রং করানোর রং ছিল ঘরে। কয়েক জায়গায় জং ধরেছে। মালতী নিজে

থেকেই বললো, 'মজুরি দিতে হবে কিন্তু। আমি সব রং লাগিয়ে দিচ্ছি।'

দু' দিন ধরে সত্যি দিল। মজুরিও নিল। সে দু'দিন সুকুমার ঘরে শুয়ে শুয়ে সিগারেট ফুঁকলো। খালি খাটে একটা শতরঞ্চির ওপর এমন ভেঙেচুরে শুয়ে থাকলো আগাগোড়া—আমারই বার বার বলতে ইচ্ছে করছিল—এই চব্বিশ-পঁচিশ বছরের জীবনে কি করেছ এত দিন? তোমার হবি কি? কি ভালো লাগে? কোনো সলিড নেশা নেই?

আরও বলার ইচ্ছে ছিল। যেমনঃ দৌড়ঝাঁপ করে শরীরটাও বানাওনি?

কিন্তু বলা যায় না। কেননা, ওরা আমার আশ্রিত। ওদের আমাকে জীবনে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে।

মুরগীগুলো বড় হয়ে ডিম দিলে ওরা জীবনে দাঁড়াবে। এখনো ছ'মাস।

আমার আজকাল মাথা যে কত দিকে খোলে—কি বলবো! দুনিয়াটা এখন আমার সামনে, যতদূর দেখা যায়, রেলের পাটি হয়ে সরলসিধে পড়ে আছে। শুধু টাল সামলে এগিয়ে গেলেই হয়।

দুপুরে খেতে বসেছি। দেখলাম, সুকুমার তার ঘরে তখনো বসে বসে কাগজ পড়ছে। একটা হাঁক দিলাম। 'খাবে এসো।'

ও শুধু ভদ্রতা চুষতে চুষতে ঠোঁট-মুখ ভেঙে বললো, 'যাই মামাবাবু।'

আমি আবার একা একা মোটেই খেতে পারিনে। একা একা সিনেমাই দেখিনে কোনদিন। কলকাতার রাস্তায় যেখানে অনেক লোক এক পা তুলে দিয়ে জুতো পালিশ করায়—সাধারণত সেখানে গিয়েই আমি বুট পালিশের কাঠের বাক্সে পা তুলে দিই। পাশের লোককে আনকলড্ ফর বলি, 'গরম বাড়ছে দাদা।' সে অনেক সময় জবাব দেয়—আবার দেয়ও না। আমার কোনো মান-অপমান নেই। লোকে কত অল্পে অপমানিত হয়, দুঃখ পায়, রেগে যায়—

আমার সে সব কিছুই হয় না। অনেক সময় লোকে বুঝিয়ে দিলে আমি অপমানিত হই বা রেগে যাই। আমার ও সব হওয়া উচিত বলে হই। নয়তো নয়।

কিন্তু সুকুমার এল না। মালতী কাছে এসে বললো, 'ও আপনার সামনে খেতে লজ্জা পায়—'

আমার এই প্রথম খুব অপমান হলো। আপনা-আপনিই হলো। কাউকে বুঝিয়ে দিতে হলো না। এই প্রথম আমি দেখতে পেলাম—আমি একজন মালিক। ও আমার সঙ্গে সহজ হতে পারছে না, অথচ আমি তো সহজ হতে চাই। আমি চেয়েছিলাম, ও আমার সঙ্গে সহজ হোক। একসঙ্গে হু'জনে পরামর্শ করি।

সেদিন দেবী গিয়েছিল দৈতরির বউয়ের জন্যে শাড়ি পছন্দ করে দিতে। দেশে যাবে দৈতরি। হু' দিনের জন্যে। কাছেই দেশ।

সুকুমারকে এক ধমক দিয়ে ব্রুডার বক্স পরিষ্কার করতে পাঠিয়েছি। কাল মুরগীদের জলে পারম্যাঙ্গানেট মেশায়নি। সেজন্যেও কিছু বকাবকি করে ফেলেছি। আসলে কেউ কোনো গোঁজামিল দিলে আমার ভারি খারাপ লাগে। আর সত্যিই তো, গোঁজামিল দেবে কেন? কই, মালতীর তো কত উৎসাহ!

বিছানায় শুয়ে শুয়ে মুরগীর হৃদয়চর্চা করছিলাম। ওদের বুকের ভেতর দিয়ে কিভাবে রক্ত চলাচল করে তার সচিত্র ছবি দিয়েছেন লেখক। তীর এঁকে এঁকে শিরা-উপশিরার গলিপথগুলো দেখানো হয়েছে। হ্যাঙ্গার থেকে শব্দ করে আমার পাঞ্জাবিটা পড়লো।

বই সরিয়ে দেখি, মালতী। পাঞ্জাবিটা তুলে রাখছে। 'হুটো সিগারেট নিলাম।'

চোখ তুলে তাকিয়ে আছি দেখে বললো, 'ওর সিগারেট ফুরিয়ে গেছে।'

'বেলা বারোটা বাজতে-না-বাজতে হু' প্যাকেট ফুঁকে দিল?'

'তা আমি কি করব—'

এমনভাবে দাঁড়ানো মালতী, বুঝি এইমাত্র ও একটি মূর্তি হয়ে গেল। নখ বসিয়ে দেখতে ইচ্ছে হলো, ফলপাকুড়ের মতো দাগ ধরে কি না।

আমি উঠে বসলাম। আমাদের পেঁপে গাছের ডালে একটা চড়ুই শুধু গোলমাল করছিল।

আমি ওকে বুকে নিয়ে ঠোঁটের গন্ধ নিলাম। চুমো খেতে পারলাম না। ঠোঁট ওর চিবুক থেকে ঘষে এনে গলায় কণ্ঠমণির ওপর চেপে ধরলাম—তারপর চোখ বুজে মাথাটা প্রায় উঁচু খড়ের গাদায় গুঁজে দিলাম।

ও যেমন ছিল, তেমনই দাঁড়িয়ে রইলো। মাথা তুলে দেখি গরম, ভারি, টানা নিঃশ্বাসে মালতীর বুক, নাকের পাটা উঠছে নামছে।

'এ তুমি কি করলে জগদীশদা—?'

'কিছু না। এ আর এমন কি। এ সব গায়ে মাখতে নেই মালতী।'

মালতীর চোখ নিঙড়ে অশ্রু টাইপের কিছু জল বেরিয়ে আসছে বুঝতে পারতে পারলাম।

'কি বলবি বল—'

ও কিছুই বললো না। তখন আমি আমাকে আলমারির আয়নায় দেখতে পেলাম। একটি মাঝারি বয়সের পুরুষলোক দাঁড়ানো। ওকে আমি চিনি। নাম শ্রীজগদীশ রায়। মালতীকে বললাম, আমাকে তোর খারাপ লাগে?'

এবারও মালতী কিছু বললো না। আমার খুব লজ্জা হলো। বলতে চাইছিলাম, তোর জন্যে আমার কোনো উইকনেস্ হয়নি। আসলে তুই কেমন তাই জানার ইচ্ছেটাই কাজ করেছে। আমি হলাম গিয়ে প্রোঃ রায়। ফাইভ ইন ওয়ান। আমার মধ্যে আমার মতো আরো পাঁচ-ছ' জন আছে। তাঁদের কারও একজনের আহ্লাদ হয়েছে—তাই ওসব করে ফেলেছে এই মাত্র। এমনও তো হতে পারে, তাঁর খুব জানার ইচ্ছে, একবার দেখে, এখনকার মেয়ে কেমন হয়।

আসলে দেবী খুব রেসপেক্‌টেবল্‌। তাই জগদীশের প্রাণ চেয়েছিল, একবার দেখে জ্যান্ত অর্ডিনারী কেমন হয়।

আবার বললাম, 'আমাকে তোর খারাপ লাগে ?'

'তা কেন ? আপনি কত ভালো !'

বুঝলাম, কৃতজ্ঞতা। অথচ আমি তো তা জানতে চাইনি। মুখে বললাম, 'এসব গায়ে মাখিস না কখনো।' আর বলতে পারলাম না। মুখে এসে গিয়েছিল—চান করে ফেললেই ভুলে যাবি।

আমি ঘুরে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম লবির দিকে। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর বসানো শখের ঘড়ি থেকে কলের পাখি বেরিয়ে এসে বনাঞ্চলের বসন্ত পাখি হয়ে ডেকে উঠলো ছ'বার। তারপর ঘড়ির ভেতরে চলে গেল।

মালতী আমার কাঁধে হাত রেখে কি যেন বলতে যাচ্ছিল। পরে, অনেক পরে বুঝতে পেরেছিলাম, ও আমাকে খুব নিজের লোক মনে করেই গায়ে হাত রেখে কিছু বোঝাতে চাইছিল। সেদিন আমি ভেবেছিলাম অন্যরকম।

সিনেমায় দেখা যায়, ঝড়ের রাতে বিদ্যুৎ আকাশ থেকে নেমে এসে বড় গাছ চিরে, উপড়ে ফেলে দিয়ে যায়। মালতীর হাতখানা আমার শরীরটাকে কলাগাছের চেয়েও তাড়াতাড়ি চিরে ফেললো। আমি ওকে সহজেই পাঁজাকোলে তুলে লাইব্রেরি ঘরে চলে এলাম। ও শুধু ছ'বার বললো, 'না, না।'

শেষে বললো, 'ও যেন চলে না যায় দেখো। যে করে হোক ওকে আটকাও জগদীশদা।'

ঘেমে নেয়ে উঠেছিলাম প্রায়। চমকে উঠলাম। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় ধাতস্থ হয়ে এসেছি প্রায়, তখনো মালতী বলছিল, 'তুমি যা বলবে সব শুনবো জগদীশদা। ওকে আগে আটকাও। যেতে দিয়ো না যেন—তুমি যা চাও, যা বলবে তাই করবো আমি—'

আমি গুম হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। তখনো 'আধুনিক

পোলট্রি ফার্ম' বইয়ের সপ্তম পরিচ্ছেদের একটি স্তবক আমাকে খোঁচাচ্ছিল : 'আপনারা মুরগী পালনের আধুনিক পরিচয় পাইবেন বিদেশী হোটেলে। আমাদের দেশের বড় বড় হোটেলেও এই প্রথা চালু হইয়াছে। চিমনির আকারে কাঠের ঘেরা ঘর সিধা উপরে উঠিয়া যাইবে। থাকে থাকে একটি করিয়া ভালো জাতের মুরগী দুই বর্গফুট পরিমিত জায়গার মধ্যে চলাফেরা করিয়া দীর্ঘ দুই বৎসর রোজ একটি করিয়া ডিম দিবে—নিষ্ফলা হইয়া গেলে প্রায় দুই কিলোগ্রাম ওজনের মাংসও পাওয়া যাইবে—কেননা, অল্প পরিসরে ঘোরাফেরার ফলে এই প্রথায় মুরগীর গায়ে প্রচুর চর্বি জমে।'

আমি মানসনেত্রে পরিষ্কার দেখতে পেলাম, আমার চেনাজানা যত ছাদ—সর্বত্র সারি সারি কাঠের চিমনি ঘর আকাশে উঠে গেছে। থাকে থাকে পোষা কৃতজ্ঞ মুরগীরা ধীরেসুস্থে নড়াচড়া করছে।

ওইদিনই বিকেলে সুকুমারকে কলকাতা পাঠালাম। রাত আটটার মধ্যে ফিরতে হবে বলেও দিলাম। দু'মাস বয়সে মুরগীদের খাবার পালটাতে হয়। তার অন্তত দু' বস্তা আনা চাই।

আধঘণ্টার ভেতর সুকুমার ফিরে এল। খাতা দেখে দেখে আমার চোখের দফা গয়া।

'মান্থ্লি, মানিব্যাগ দুই-ই পকেটমার হয়ে গেল প্ল্যাটফর্মে—'

'ভালো কথা! পকেটমারের পকেট মেরে নিয়ে এসো।'

সুকুমার তখনো হাসছিল। তারপর আমার মুখ দেখে বুঝলো আমি গম্ভীর। তখন ওর মুখের আলোও নিভে গেল।

গরু তোলা হয়নি গোয়ালে। একা একা জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে ভিজছিল। আমি দাঁড়িয়েছিলাম, কোয়ার্টারের গ্রিলঘেরা বারান্দার ভেতরে। সুকুমার বাইরে। আমি উঁচু বারান্দায় আর ও নিচু মাঠে। কি মনে হলো ওর—একবার মাথা তুলে তাকালো, 'ইচ্ছে করে তো হারাইনি।'

কথাটা খুব সত্যি। কিন্তু যে ক'টা টাকা নষ্ট হলো—ওগুলো তো আমারই চোখের মাথা খেয়ে খাতা দেখার টাকা। তাও তো

সত্যি! একরকমের রাগ হচ্ছিল। বছর চোদ্দ-পনর আগে আমি তো ওরই বয়সী ছিলাম। তখন কি এতটাই আনাড়ি ছিলাম আমি! অসম্ভব।

'দশ হাত মাটি খুঁড়লে একটা পয়সা বেরোয় না জানো—'

ও মাথা নিচু করলো। আমি ওর তালু দেখতে পাচ্ছি। এই বয়সেই চাঁদি বেরিয়ে পড়েছে। নিচু হয়ে মেঝেতে ঘষে সিগারেট নেভাতে গেছি—ধক্ করে উঠলো বুকের ভেতরে। আমার পেছনে অন্ধকারের ভেতর মালতী দরজা ধরে দাঁড়ানো। কখন এসেছে। এই প্রথম বুঝলাম, ওর সামনে আমি নিজেকে অপরাধী মনে করে ফেলছি।

ততক্ষণে সুকুমার অ্যাবাউট টার্ন করে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে। আরেকটু পরেই কলেজ কম্পাউণ্ড ছেড়ে রাস্তায় পড়বে।

মালতী ছুটে এসে আমার হাত ধরলো। দেবী কাছাকাছি থাকতে পারে। রঘু মাঠের ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে। না হোক আমাদের গুরু তো সব দেখতে পাচ্ছে। হাত ছাড়িয়ে নিলাম।

'ওকে ফেরাও জগদীশদা!'

'এখন কোনো ট্রেন নেই। ফিরে এল বলে।'

'না, ও ফিরবে না। দেখে নিও তুমি—' মালতীর চোখে জল এসে গেল। আমি জানি লোকের এসব হয়। মানুষ এরকম করে। আমার কোনদিন হয়নি। দেবী সেরকম কিছু কোনদিন করেনি। কিন্তু সত্যি সত্যি হয়—একেবারে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। এরকম সিনে গাইতে হয়ঃ তার বিদায়বেলার মালাখানি—থাকে তো সিনেমায়!

মফঃস্বলের রাস্তায় বেরোলাম। ল্যাম্পপোস্টের আলোগুলো একই সঙ্গে জ্বলে উঠলো। কি লাকি ছেলেটি। আমি লব্ধপ্রতিষ্ঠ যশস্বী প্রোঃ জগদীশ রায় তাকে খুঁজতে বেরিয়েছি। সেধে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাব। হিংসে হওয়া উচিত ছিল আমার।

মোড়ে সিগারেটের দোকানের কাছে গেলাম। একটা দশ পয়সা দিয়ে চারমিনার নিচ্ছিল।

বললাম, 'দু' প্যাকেট নাও। কাল সকালেই তো আবার দৈতরিকে ঠেলে পাঠাবে—'

'কে? মামাবাবু—' কৃতজ্ঞতায় ওব মুখে হাসি ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। চোখ ছলছলে। রাগে রাগে এতটা এগিয়ে এসে নিশ্চয় ভেবেছে, কি করলাম! এখন যে কলকাতার ট্রেনও নেই। থাকলেও কোথায় যেতাম। এই ক'দিনে বউকে নিশ্চিন্তে কাছে পেয়ে, মাথার ওপর নির্ভর ছাদ পেয়ে কত তাড়াতাড়ি আলসে হয়ে গেছে।

ফেরার পথে আমি বলতে চাইলাম, 'ছাখো সুকুমার—এই যে আমাকে এখানে দেখছো—কত নিশ্চিন্ত নিরাপদে আছি—এ জায়গায় পৌঁছতে আমাকে একাই সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়েছে। কোনো লিফট ছিল না—কেউ বাঁশ দিয়ে ঠেলে তোলেনি।' থেমে দম নিয়ে বললাম, 'আমি সেলফ্‌মেড। কারো ভেতরে আনাড়িপনা দেখলে আমি রেগে যাই সুকুমার—' বলে মনে হলো, এ আমি কি করছি। এত বড় পৃথিবী—তাতে কত বড় বড় জিনিস থাকে—মেঘ, এণ্ডলেস মাঠ, ছায়াহীন গোল পূর্ণিমার চাঁদ। আর আমি কিনা সেখানে একজন জ্যান্ত মানুষের মালিকের পোজে তার ভুল ধরতে যাচ্ছি, ধমকাচ্ছি, কৈফিয়ত নিচ্ছি, দর্শন দিচ্ছি! ও নিশ্চয় এখন শুধু শুনে যাবে। পরে একা একা গজরাবে। আমিও যে তাই করতাম। মাঝখানে মাত্র দেড় যুগ সময় কেটে গেছে। তাছাড়া আর সবই তো এক। ঢোক গিলে বললাম, 'আমি তোমার শুভানুধ্যায়ী, সুকুমার।' আমারই কানে কেমন বেসুরো শোনাচ্ছে। তবু বলে গেলাম, 'আমি চাই তোমরা দু'জনে নিজের পায়ে দাঁড়াও—আরও মুরগী বাড়াও। এক্সপ্যাণ্ড করো—ইলেকট্রিক ইনকিউবেটর বসিয়ে ডিম ফোটাও। ফি' রবিবার কলকাতায় গিয়ে মারকেটে মারকেটে ঘুরে দেখ—কোথায় কত মাংসের চাহিদা। তেমনি ভাবে এখন থেকেই তৈরি হও। আমি ঠিক ক্যাপিটাল যুগিয়ে যাব—'

ছোকরা ইনস্‌পায়ার্ড হয়ে গেল। আমরা দু'জনে যখন বাড়ি

ঢুকছি—আমাদের কথাবার্তায় যে কেউ বুঝবে—আমরা দু'জনেই একই বিজনেসের পার্টনার।

'আমার কথায় রাগ করবে না। ওরকম আমি মাঝে মাঝেই রেগে যাব। গায়ে মাখবে না একদম—'

'আপনি গুরুজন, মামাবাবু—'

'ওটা ছাড়ো তো। কোন্‌দিন দাদু ডেকে বসবে শেষকালে!'

হোঃ হোঃ করে হাসতে লাগলো ছেলেটা। কাছেই শালগাছটা দাঁড়ানো। সন্ধ্যের হাওয়ায় পাতা মেলে ধরে আলসেমি ভাঙছিল। টের পেলাম, আমি ওরকম হাসতে পারিনে—জানিই না। শুধু হা-মুখ বড় করে দাঁত দু'পাটি যতটা পারি মেলে ধরে আছি। ও দেখুক, আমি কেমন নিঃশব্দে কত বড় করে হাসতে পারি।

ব্যাপারটা বোধহয় মালতীর কাছে দেবীও শুনে থাকবে। আমরা বেরিয়ে পড়ার পরে বলেছে নিশ্চয়। হাসির আওয়াজ পেয়ে ওরা দু'জনে একসঙ্গে বারন্দায় বেরিয়ে এল। দেবীর পাশে মালতী কত ম্যাটমেটে। ছায়ার চেয়েও ফিকে দেখাচ্ছে এখন।

আমাদের হাসতে দেখে মালতীর মুখে আলো ফিরে এল। আমরা বারন্দায় উঠতেই ও বললো, 'আমি কিন্তু নেফটিন সবটাই জলে দিয়ে দিয়েছি।'

শুনে গা জ্বলে উঠলো। সাতদিনের অ্যান্টিজার্ম একবারে দিয়ে বসে আছে। মুরগীগুলোর গ্রোর্থ থেমে যেতে পারে। পেটের ভেতরের ডিমের কুঁড়ি আর কোনদিন নাও ফুটতে পারে। কিন্তু কিছুই বলা গেল না। বললে খারাপ কথা বলতে হয়। তাহলে তো আবহাওয়াই মাটি হয়ে যাবে। আমি একাই এই মঞ্চের নট—একাই দর্শক। আমাকেই শুধু সবদিক মানিয়ে চলতে হয়। আর সবাই কেয়ার-ফ্রি। মুখে হাসি এনে বললাম, 'নে, তোর বরকে এখন আটকে রাখ। কোনোদিক দিয়ে যেন বেরিয়ে না যায়—'

দেবী ফস করে আমাকেই বলে বসলো, 'তুমি বাপু সব কিছুতে কথা বলতে যাও কেন?'

আমার সম্বন্ধে ওর সিদ্ধান্ত এত আগে নেওয়া থাকে কি করে ভেবে পাইনে। যে কোন ব্যাপারে আমাকেই দোষী স্থির করে নিয়ে ও দিব্যি এগোয়—খুব কনফিডেন্টলি। হাসি পাচ্ছিল। সত্যি যদি আমার দোষ করার ইচ্ছে থাকে—তোমার বাবাও ধরতে পারবে না, দয়া।

সুকুমার আর ওখানে দাঁড়ায়নি। আমাদের কোয়ার্টারের ছাদে কাঠ, জাল, টালি মিলিয়ে প্রায় তিনশো বার্ডের নতুন আস্তানা হয়েছে। তার ভেতরে মাস দুয়েকের বাচ্চারা সবকিছু ওলোট-পালোট করে ফেলছে।

সুকুমারের পেছন পেছন আমিও দোতলায় উঠে এলাম। সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং-এ আমরা দু'জনই যখন খুব কাছাকাছি, যেন কোনো সাক্ষী না রেখেই বললাম, 'আমাকে আমি বানিয়ে তুলেছি সুকুমার। তুমিও তোমাকে বানাও। এমন চান্স আর পাবে না—'

কৃতজ্ঞতায় ওর মুখ লালায় ভর্তি হয়ে গেল। কথা বলতে পারছে না। তার ভেতরেই জড়িয়ে জড়িয়ে বললো, 'আপনি যখন যা বলেন—আমি তখন তাই করি মামাবাবু—'

ভীষণ টানটান লাগছিল সুকুমারকে। আমার ভারি হাতের থাবা রাখলাম ওর পিঠে।

॥ চার ॥

মাঝে মাঝে ভাবি রঘুর হাত ধরে মনীষাদের বাড়ি বেড়িয়ে আসি। কোনো অসুবিধা নেই। কোথায় থাকে জানি। ভালো পাড়ায় মোড়ের মাথায় বাড়ি। ট্যাক্সি থেকে নেমে দরজায় দাঁড়িয়ে বেল টিপতে হবে। কেউ বেরিয়ে আসবে। তাকে বলতে হবে—মিসেস মুখার্জি আছেন? মনীষার বিয়ে হয়েছে এক মুখার্জির সঙ্গে ছেলেটি ডাক্তার। এসব মনীষাই আমাকে বলেছিল। টেলিফোনে।

তখন আমাদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ। একটা ভাঙা

ভালোবাসার কিনারে দাঁড়িয়ে আছি। যেখানেই থাকি—যেখানেই দাঁড়াই, স্মৃতির পোকারা পা বেয়ে উঠে আসে। বিয়ে করার আগে ফোন করেছিলাম—'আমার বিয়ে। তুমি আসবে?'

'নেমন্তন্ন চিঠি পাঠালেই যাব।'

আশ্চর্য! এত ভালোবাসার জিনিস কেমন পালটে গেল। তখন আর আমার কোনো কষ্ট ছিল না! নেমন্তন্ন চিঠি পাঠাইনি।

মনীষাকে খারাপ বলার মতো আমার কোনো কথাই নেই। আমার তো এখনো মনে হয়—মনীষা বড় ভালো মেয়ে, বড় নরম। আমাদের যে বিয়ে হয়নি সেজন্যে ওর তো কোনো দোষ নেই। আমরা যে জা্গায় বাস করি সেখানে ও ওরকমভাবেই বেড়ে উঠেছে। ওর পক্ষে বেরিয়ে এসে আমাকে বিয়ে করার উপায় ছিল না। বিয়ে হলেও শেষ অবধি ভালো হতো না। কেননা, ওর মনের স্বপ্নে নিশ্চয় শেষ পর্যন্ত ঘা খেত।

মনীষা কেমন ছিল বলা দরকার।

মোটামুটি লম্বা। বাঁ গালে ফ্যাকাশে জড়ুলের দাগ ছিল। হাসলে সরল সরল দেখাতো। সত্যিই সরল ছিল। আমি ততদিনে অনেক ঘা-খাওয়া মানুষ। কোনো জিনিস সহজ দেখলে সন্দেহ হতো। কোনো একটা কোণ থেকে সবকিছু দেখতে ভালো লাগতো। আমারই দোষ। দোষ আমারই।

মনীষা যে সত্যিই একটি নিষ্পাপ পিওর জিনিস—এ ব্যাপারট বুঝতেই আমার অনেকদিন লেগেছিল। বুঝে ওঠার পর ওকে আমার খুব খাঁটি, খুব দামী লাগতো।

কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

আমরা দু'জনে দূরে সরে যেতে শুরু করেছি। মনীষা সরে যাচ্ছিল—কারণ, ও বুঝতে পেরেছিল, ওর বাবার মনোবাঞ্ছামতো পাত্র আমি কোনদিনই হতে পারব না।

আমি সরে যেতে শুরু করেছিলাম—অনেক ব্যথায়—কারণ আমি ততদিনে টের পেয়ে গেছি—মনীষা অন্য কাননের পাখী।

তবু আমার কোনো দুঃখ নেই। কোনো নালিশ নেই। আসলে যে মনীষা খুব ভালো মেয়ে। ও খুব লজ্জার সঙ্গে বলেছিল, 'আমি এম. এ. পরীক্ষায় ভয়ঙ্কর ভালো নম্বর পেয়েছিলাম—'

তখন মনীষা জানতো, আমার ডিগ্রি-ফিগ্রি বিশেষ কিছু নেই। তখনো ডিগ্রি এরকম চিনি-বাতাসা হয়ে যায়নি। তাই ও ভালোবাসায় আমার সমান হয়ে যাওয়ার জন্যে আগে-পাশ-করা পরীক্ষায় বেশি নম্বরের লজ্জায় মরে যাচ্ছিল। ব্যাপারটা নিশ্চয় ছেলেমানুষি। তবু খুবই ঘন। ভালোবাসায় বেলের সরবত টাইপ।

আসলে আমি কি মনীষাকে ভালোবাসতাম ?

না। আমি খারাপ লোক। তাই ওর ভেতরে যা-কিছু ভালো জিনিস দেখে তাতেই চলেছিলাম।

ভালো জিনিসে লোভ আমার অনেকদিনের।

ভালো মানে অর্ডিনারি ভালো না। আমি বলতে চাই—গাছের পাতার ঘন গম্ভীর রং, মেঘের ছায়া, ঢেউয়ের ফেনা—এসব আর কি! এতদিনে বুঝি, কেন এমন হতো। আমার খারাপ হয়ে যাওয়ার ভেতরে—আমার ভালো হয়ে ওঠার আড়ালে এই রঙীন পৃথিবীর দান অনেকখানি। আমি যা কিছু শিখি—সবই গাছপালা, আলোবাতাসের কাছ থেকে। মানুষ আর আমাকে শেখাবে কি!

মনীষাও বোধহয় আমাকে ভালোবাসত না। ও চাইতো, কাউকে ও যেন ছায়া দিয়ে, আলো দিয়ে বড় করে তুলতে পারে! তাই বোধহয় মনীষা আমাকে কতদিন পুষ্টিকর আপেল, ছানা, আঙুর খাইয়েছে। স্নেহ করার মতো কাউকে ওর দরকার ছিল। আমি সেই দরকারের খোপে দিব্যি সর্ট করা মেল।

গোপালনগরের মোড় পেরিয়েই আদি গঙ্গার ওপর ব্রিজ। একধারে নবগ্রহ মন্দির। বৃহস্পতি ঠাকুর বরাভরের মুদ্রা তুলে বাঁ হাত উঁচু করে আছেন। নিচেই মরা গঙ্গায় খাটালের মহিষের পাল নেমেছে। আমাদের ট্যাক্সিটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কালীঘাটের দিকে মোড় নিল।

আমি ঢলে গিয়ে মনীষার গায়ে পড়ে গেলাম। দুপুর। বৃষ্টি হচ্ছে। রহস্যসন্ধানী ডিটেকটিভের স্টাইলে ড্রাইভার নিঃশব্দে গাড়ি চালাচ্ছিল। আমাদের প্রেমালাপ ওর পাগড়িঢাকা কানে ঢোকার কথা নয়।

আনতাবড়ি জড়িয়ে ধরতে গিয়ে আমার হাত ওর হাঁটুতে গিয়ে লাগলো। ততক্ষণে এলো বাতাসে খানিক কেঁপে উঠেছিল শাড়ি। আমার হাত ওর গায়ে। মাথা নিচু করে খুব ধীরে-সুস্থে মনীষা আমার ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরলো।

সেই প্রথম বলা যায়। অবশ্য তার আগে আরতি। সে তো প্রায় স্মৃতি।

অমন অন্ধকার করে আসা বৃষ্টির মধ্যে আমার ভেতর অবধি আমি জেগে গেলাম। অথচ সামান্য চুম্বন। অসামান্য বালিকা। এই মেয়েই বাড়িতে বার্লির মাড় দিয়ে শাড়ি ইস্ত্রি করে। ওর বাবা যখন গরীব ছিল—তখনকার অভ্যেস।

আমরা ঝগড়া করিনি। মনীষা অভিমান করেনি। আমার কষ্ট হলেও প্রকাশ করিনি। আমরা দ্বিমত হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম। ভদ্রতা, ভালোবাসা, কষ্ট, আত্মসম্মানের বিষাদ নিয়ে আমি রোজ ভারি গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিলাম।

কিছু করার ছিল না।

পরে মনীষার জন্যে আমার কোনদিন কষ্ট হয়নি। আমি শুধু ভুলে গেছি। শুনেছি, ট্রেনের চাকায় হাত-পা কেটে গিয়ে দূরে ছিটকে পড়লে নাকি কোনো ব্যথাবোধ থাকে না খানিকক্ষণ। চোখে দেখে তবে জ্ঞান হারায় লোকে। আমি হারিয়েছিলাম বোধ। এখনো মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়—তা কি আর ফিরে পেয়েছি! নয়তো অপমানকে অপমান বলে চিনতে পারি না কেন? বলে দিলে তবে বুঝি। কাউকে মনে ব্যথা দেওয়ার অনেকক্ষণ পরে মুখ দেখে বুঝি, অনিচ্ছায় ব্যথা দিয়ে ফেলেছি।

আচ্ছা ধরাই যাক—রঘুর হাত ধরে মনীষাদের বাড়িতে গেছি। মিসেস মুখার্জী বলে খোঁজ নিতেই বেরিয়ে এল। আমাকে দেখে তো

বোবা মেরে গেল। অস্বস্তি, লজ্জা, বিপদ, স্মৃতির আলপিন—সব কিছুই হতে পারে। আমরা দু'জন বয়স্ক মানুষ। সেখানে একমাত্র রঘুই পরেকার মানুষ—নেহাত বালক।

তার সামনে স্বাভাবিক হওয়ার জন্য মনীষা ওর সিঁথির অগোছালো চুল আঙুল দিয়ে সরিয়ে দিল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কি মনে করে?' জবাব চায়নি মনীষা। বলতে হয় বলে বলেছে। রঘুর হাত ধরে আগে গিয়ে বসার ঘরে ~~বসার ঘরে~~ বসলো।

সামনেই দেওয়ালে শ্রী ও শ্রীমতী মুখার্জীর একখানা বাঁধানো ফটো দেওয়ালে। আর ভাবা যাচ্ছিল না। মালতী এই মাত্র চা দিয়ে গেল। ইজিচেয়ারে শুয়ে পা দু'খানা মোড়ায় তুলে দিয়ে আছি। এই অবস্থায় আমাকে যদি ভগবান বা শয়তান—যে কোনো একজন নিজের রাজ্যে নিয়ে যেত! ভগবান হলে নিশ্চয় আমার বিচারে বসতেন। শয়তান হলে আমাকে জামিনে খালাস করে নিত। কিছুদিনের জন্যে আয়ু ফিরে পেতাম। আবার জীবনটাকে ক্লাশ থ্রি থেকে ট্রায়াল দিতাম। দাড়ি কামিয়ে হাফপ্যাণ্ট পরে স্কুলের ব্যাগ কাঁধে ফেলে সোজা ফার্স্ট বেঞ্চে গিয়ে বসতাম। প্রথম দিন থেকেই ভালো ছেলে হওয়ার সবরকম কসরত শুরু করে দিতাম।

তা হওয়ার নয়। উঠে গিয়ে গরুর পাশে দাঁড়ালাম। আমার ছায়া ওর পেটে পড়তেই ঘাস খাওয়া থামিয়ে মাথা উঁচু করে তাকালো। কত সুদূর—কত ঘন সে দৃষ্টি। কোন্ বিগত জন্মে এই গরুর সঙ্গেই বোধহয় বনে বনে লতা, ঘাস, কচিপাতা খেয়ে ফিরেছি। সে সব কথা ওর মনে পড়তেই ফিরে তাকিয়েছে। আমার কিচ্ছু মনে নেই। আমি শুধু খুব সহজেই ভুলে যেতে পারি।

গলায় আস্তে করে হাত বুলিয়ে দিলাম। আরামে মুখ তুলে আকাশে তাকালো। কাছেই ঘরের ভেতরে রেডিওতে সকাল সাড়ে-সাতটার বাংলা নিউজ হচ্ছে দিল্লি থেকে। দু' কান খাড়া করে ও শুনতে লাগলো। ধারণা, বোধহয় আমিই কিছু বলছি। কোনো আদরের কথা। মানুষের গলায়।

আমি বললাম, 'তুমি কি আমাকে চেনো ?'

ধারেভিতে কেউ নেই। ও শিং ঝাঁকিয়ে লম্বা জিভটা বের করল তারপর লোকে যেখানে তাগা বাঁধে—আমার হাতে টিকের দাগের ওপর খস খস শব্দ করে চেটে দিতে লাগলো। খড়খড়ে জিভ লালায় ভর্তি। কৃতজ্ঞতা, সেক্স কত কি হতে পারে। কিংবা শুধুই জিভের শুলশুলানি। এইভাবেই হয়তো আরাম পায়।

কেউ শুনতে পায়নি আমার কথা। কলেজের বারসার এইমাত্র অফিস-রুমে ঢুকলো।

'তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছো ?'

বাছুরটা হাম্বা হাম্বা করে ছুটে এল। ও সেদিনের। ওর আমাকে চেনার কথা নয়। নেহাত গৃহপালিত পশু। আমাদের ফ্যামিলির লোক হয়ে গেছে যেন। মুদির দোকান থেকে মাস কাবারির সঙ্গে ওদের জন্যে আসে চুনিভুষি।

সতের বছরের জগদীশ রায়, সাতাশ বছরের আমি, সাঁইত্রিশ আটত্রিশ বছরের আমি বা দেবীর স্বামী—এরা তিনজন কত ভিন্ন এখন আমার একমাত্র পরিচয়—এই মফঃস্বলে প্রোঃ জগদীশ রায় অথচ আমি তো এমন ছিলাম না। পরে কি হয়ে যাব তাও জানি না। ভবিষ্যতের মোড়ে মোড়ে কত রকমের রহস্য, বিস্ময় আমারই জন্যে দানা বেঁধে জমা হয়ে আছে।

বিশেষভাবে একটা কথা বলা দরকার। কয়েক বছর হলো, আমার এই শরীরটাকে আমার আত্মার মলাট বলে মনে হয়। আত্মাই বা বলি কেন! ক্ষিধে, তেষ্টা, ইচ্ছে ইত্যাদি মিলিয়ে ভেতরকার জগদীশ রায়ের বাইরেকার পরিচয় এই দেহ। আস্তে আস্তে যা পুরনো হয়ে যাচ্ছে। বাঁ পায়ের গোড়ালির ওপরেই নাগাড়ে পাম্পসু পরতে পরতে একরকমের কালো কড়া পড়েছে। সাবানে যায় না তাকালে মন খারাপ হয়ে আসে। ছেলেবেলায় দেখেছি—এ সব তো বুড়ো লোকের পায়ে কিংবা কনুইতে থাকে।

পাবলিক কি বলবে জানি না—আমার কিন্তু কবুল করতে একটুও

লজ্জা নেই। আমি এই পৃথিবীর দূর্বাদলের মতোই রোজই সবুজ হয়ে ঠেলে উঠতে চাই। কোনো অচেনা পৃথিবীতে গিয়ে আমি সহজেই এখনো ইনফ্যান্ট ক্লাস থেকে শুরু করতে পারি। সে সুযোগ পেলে নিশ্চয় সাবধানে এগুবো। আগের ভুলগুলো আর কিছুতেই নয়। এখন হারানো স্মৃতিগুলোর পুনরাভিনয় ঘটলে আমি স্লো-মোশান ক্যামেরার ধীরগতি ছবির মতোই ক্লান্ত ভবিতব্যের ভেতর দিয়ে আত্মপরিচয় প্রকাশ না করেই এগিয়ে যাব। জানি না কি হবে। তবু—

রোজকার মতো আজও ছাদের মুরগীরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো। এই সময় দূরে গাছপালার আড়ালে স্টেশনে একটা ট্রেন ছাড়ে। তার বাঁশী। ঘন, গম্ভীর। চাকার আওয়াজ দূরে দূরে পড়ে থাকা মাঠগুলো শুয়ে নেয়। রিটায়ার করে আমি ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে এসব শব্দ, ঘটনা বুকের ভেতরে ধরে রাখার চেষ্টা করবো। তাতে নাকি আয়ু বাড়ে।

॥ পাঁচ ॥

আমাদের বাড়ি কিছুকাল আনন্দে ভরে আছে। এখানে খুব মেশামেশি হয়। দয়া—সরি, দেবী ইদানীং আরও মনোহারী হয়েছে। লোককে ভালো করে তোলার চেষ্টায় ও সব সময় ব্যস্ত। আজ এটা রাঁধে, কাল ওটা রাঁধে। এত উচ্ছল, এত শান্ত, এত গভীর। আমার বউ বলে মনেই হয় না। আগেকার জগদীশ থাকলে নিশ্চয় দয়াকে কিউন্যাপ করে নিয়ে যেত। জগদীশ, ফিরে আয়!

খোকনের ভালো নাম রঘুনাথ। ক্লাসের দিদিমণি ওকে আদর করে রঘু বলে ডাকেন। দুনিয়া আজ সকালে কত সুন্দর লাগছে। সবুজ গাছপালা, রঙীন ফুল সবকিছু টাটকা রোদে ঝলমল করে উঠলো। তিনশো তন্বী মুরগী গলা ফুলিয়ে নিজেদের কণ্ঠস্বর বাজিয়ে বাজিয়ে কিসের তারিফ করছে।

মালতী সকাল থেকে এই নিয়ে তিনবার কফি দিয়ে গেল। কে কাঁদে রে বাবা! 'এই। ওখানে কে? বেরিয়ে এসো বলছি।'

দৈতরি বেরিয়ে এল। পরনে তার নতুন জামাকাপড়। 'বারান্দার আড়ালে বসে কাঁদছিলি কেন? কি হলো, আজই ফিরে এলি মুলুক থেকে?'

মহা মুশকিল। একবার কাঁদতে আরম্ভ করলে আর থামানো যায় না। মালতী, দেবী, সুকুমার—যে যেখানো ছিল কান্না শুনে ছুটে এল। বার বার বলেও কিছু বের করা গেল না। আজ সকাল সকাল ক্লাস। উঠতে হবে। শেষে ধমকালাম।

'আজু নেই, বাবু।'

দেবী চমকে উঠলো, 'এই যে সেদিন কত শখ করে বাজার থেকে আমাকে দিয়ে রঙীন শাড়ি বেছে নিলে—'; থেমে গিয়ে বললো, 'এর মধ্যে এমন কি হলো যাতে আজুবাঈ মারা গেল? বাচ্চারা কোথায়?'

আজুবাঈ দৈতরির বউ।

ধমকে উঠলাম, 'কি অসুখ করেছিল? ডাক্তার নেই তোদের গাঁয়ে'

দৈতরি দেবীর কথার জবাব দিল প্রথমে, 'খোকা-খুকু মা-বাবার কাছে আছে। খুকুটা শুধু কাঁদে—'

'কি হয়েছিল?'

চোখ মুছে দৈতরি বললো, 'কিছু হয়নি তো বাবু।'

'তবে?'

দৈতরির চোখ এক সেকেণ্ডে ভিজে গেল, 'চলে গেছে—'

মালতী খুক্ করে হেসেই ভেতরে চলে গেল।

'বেশ করেছে। যাবে না তো কি। সারা বছর আমার কাছে পড়ে থাকবি। যা এখন ওঠ্। গরুর জাবনা দেওয়া হয়নি সকাল থেকে—'

দেবী বললো, 'কোথায় গেছে জানো?'

'না। তবে ময়ুরকেও আর দেখছি না মা—'

আমি বললাম, 'ময়ুর কে রে?'

দৈতরি মাথা নিচু করে থাকলো। শেষে বললো, 'লজ্জার কথা কি বলবো বাবু—ময়ুর আমার ছোট ভাই। ছোটবেলা থেকেই স্বভাব খারাপ। এখানে-সেখানে চুরি-ছ্যাঁচড়ামি করে বেড়াতো—আবার মাঝে মাঝে হঠাৎ এসে হাজির হতো।'

চমকে উঠলাম দৈতরির কথা শুনে।

'ময়ুর আর আজু পিঠোপিঠি বাবু,' চোখের জল মুছে দৈতরি বললো, 'আজু এসেছিল বারো বছর বয়সে—'

'নে আর কাঁদতে বসিসনে। চুলদাড়ি কামাবি না—সন্ধ্যে হলেই গাঁজা খাবি! বউ পালাবে না তো কি—'

স্বকুমার খুবই অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। সামনে খালি চেয়ার পেয়েও বসেনি। কেননা আমি যে দাঁড়িয়ে। চোখের ইশারায় বসতে বললাম। তাও বসলো না। খুব রগড় চলছে ভেবে নিয়ে মুখ ভরে হাসি ভাসিয়ে রেখেছে। পায়ের স্যাণ্ডেলটা ক্ষয়ে গিয়ে পায়ের সঙ্গে মিশে আছে প্রায়। কোমরে বক্‌লস্‌ লাগানোর ফিতেটা প্যাণ্টের মধ্যে গুঁজে নিয়েছে স্বকুমার। ঢলে পড়া মৃণাল-ভঙ্গীর সেই চুলের ঢেউ কিছু ভেঙে গেছে। আমার খুব মায়া হলো।

আমি দৈতরিকে কি বলতে যাচ্ছিলাম।

ও নিজে থেকেই বললো, 'অনেক আগে থেকেই পালাবে পালাবে করছিল বাবু। কি পাষাণ মেয়েলোক কি বলবো। এখন সব জানা যাচ্ছে আস্তে আস্তে। আমাদের পাশের গাঁয়ে সারের দোকানে গিয়ে ফলিডলের খোঁজ করেছে—কি মতলবটা ভেবে দেখুন একবার।'

'মানে?'

'খোকা-খুকু আর আমাকে একদম নিকেশ করে দিয়ে ময়ুরের সঙ্গে গিয়ে ঘর বাঁধবে। একটা মুরগী ছিল, ছাগল ছিল দু'টো—তাও বেচেছে। যাবার আগে বাবার একখানা কাঁসার থালা আর চোদ্দটা টাকাও চুরি করে নিয়ে গেছে—'

আমি মাথা ঠাণ্ডা করে কয়েকটা দিক চিন্তা করে নিলাম।

ফুল্লশ্রী যেখানে গিয়ে চার মাইল দূরে একটা চড়া-পড়া বড় নদীর

সঙ্গে গা ঢেলে দিয়ে মিশে গেছে, সেখানে খেয়া আছে; জোয়ারের জলে লঞ্চ ভাসে, জলের নীচে হাঙর, কামট কিলবিল করে। কেউ প ধুতেও নামে না। সেই নদীটা পেরোলেই আবাদ এলাকা। ধূ ঃ মাঠ—মাঝে মাঝে তাল-খেজুরের জটলা—আবার শুধুই মাঠ, একটা ছুটো খড়ের ঘর। সেখানে প্রাণটা হাতে নিয়ে ঘুরতে হয়। কে কার বউ ভাগিয়ে নিয়ে এল—তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কেউ নেই। সেদিব থেকেও এ তল্লাটে কেউ কেউ ভেগে আসে। তাদের হাত-পায়ের আঙুলগুলো মোটামোটা ফাটাফাটা। মুখে মাটির ছাপ।

দৈতরিকে বললাম, 'সোজা লঞ্চ ঘাটায় চলে যা—সেখানে পেলি তো পেলি, নয়তো নয়—'

দেবী বললো, 'ওর কি একা একা অমন যাওয়া ঠিক হবে? ময়ূর যেমন বদরাগী লোক—'

'তোর সম্বন্ধীকে নিয়ে যা সঙ্গে। কোথায় থাকে? কাছা কাছি না—'

'ঘোষপুর বাবু। নিরাপদকে কি এখন পাবো বাবু—'

দেবী ব্যস্তভাবে বললো, 'তবু তোমার এমন বিপদের সময় ডাকলে যাবে না?'

মুখটা খুব ছুঁচলো করে দৈতরি বললো, 'ওর-ও তো এইটেই সময় মা—'

জগদীশ চেঁচিয়ে উঠল প্রায়, 'কোথায় কাজ করে তোর শালা?'

'কোথাও না।'

সুকুমার অবাক হয়ে গেল। 'তবে কেন সঙ্গে যেতে পারবে না!'

দৈতরি নিজে বলে দিল, 'নিরাপদ কোথাও কাজ করে না বাবু এই সময়টা সে চুরি করে বেড়ায়—ডাব নারকেল, ছাগল-মুরগী যা পায়।'

আমি চুপ করে গেলাম। মালতী ভেতর থেকে ঘুরতে ঘুরতে আবার এসেছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। হেসে বললো 'খুব ভালো জায়গায় বিয়ে বসেছিলে বাপু—'

'তা বলতে পারো দিদিমণি—আমার শাশুড়ীই সবচেয়ে খারাপ—'

'শ্বশুর ?'

'শাশুড়ীর ব্যাভারেই তো মরে গেল। নয়তো কিছুদিন বাঁচতো আরো। কী শরীর ছিল !'

দৈতরির শ্বশুরমশায় এদেশীয় লোক। ওড়িশার পাহাড়ী এলাকায় ঠিকদারের কাঠুরে হয়ে গিয়েছিল। ফেরে আজুর মাকে নিয়ে। এ সব অনেক আগে শোনা।

দেবী চেয়ারে বসে পড়ে ভাবছিল, আজু কি মানুষ ! দেশে যাবার আগে এই তো সেদিন তাকে দোকানে নিয়ে গিয়ে দৈতরি আজুর মনোমতো শাড়ি ব্লাউজ কেনালো। মানুষ এরকম হয় কেন ! তার মনে লোকের জন্যে ভালোবাসা গাছের ছায়ায় ঘন কালো রঙের পাথর হয়ে পড়ে আছে।

আমার আর দাঁড়ানোর সময় ছিল না। বাথরুমে ঢোকার আগে মালতী আমাকে তোয়ালে সাবান এগিয়ে দিতে এসে ধরা পড়লো। 'কি হচ্ছে—দেখে ফেলবে—'

ভয়ও পাচ্ছে। নিশ্চয় ভালোও লাগছে ওর। তখনো দেবীর পাশে সুকুমার বারান্দায় দাঁড়ানো। এ আমি কি করছি ! মাথা মুছে বেরিয়ে আসার সময় চিরুনি হাতে ধরে দিল মালতী। জগদীশ আজ তিন বছর সিঁথি কেটে মাথা আঁচড়ায়। আয়নায় দেখলো একজন সৌম্যদর্শন গৃহস্থ তার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে মনে তাকে তারিফ করলো জগদীশ। তারপর মালতীকে ভাত দিতে বলে নিজেই লবিতে দাঁড়িয়ে বললো, 'মালতী, কে বেশি ভালো রে ?'

প্রথমে মালতী বুঝতে পারেনি। চোখ তুলে তাকালো।

'আমি না তোর সুকুমার ?'

'ওকে শুধু শুধু টানছো কেন ?'

'বললেও গায়ে লাগে। ভালো ! ভালো !'

কলেজে গিয়ে দেওয়ালে তিনটি নতুন স্লোগান চোখে পড়লো। একটার শেষে লেখা আছে, 'পিঠের চামড়া তুলে নেব।' আরেকটা

কিছু জটিল। শোষণ ও শোষক সংক্রান্ত। অনেকখানি ব্লু রং গেছে। প্রথমে হোয়াইট ওয়াশ করে নিয়ে তার ওপরে লেখা ঃ এই সমাজের গর্ভে নতুন সমাজের জন্মের সময় ধাত্রীশক্তির নাম—বলপ্রয়োগ।

ততদিন কি আমি সুকুমারকে টিকিয়ে রাখতে পারব! ওরা সুকুমারের জন্যে এখুনি কিছু করে দিতে পারে না! কবে বিপ্লব আসবে—তারপর! অন্তত এই চারটে মাসও যদি পারতো। ততদিন মুরগীগুলো বড় হয়ে ডিম দিতে শুরু করে দিত।

রিচার্ড দি থার্ড, পড়াচ্ছি আজ ছ' বছর। সেকস্‌পীয়রের মনে যে লেখার সময় কত ভাবের খেলা চলতো। সামনের বেঞ্চে একটি ছেলে বসে বসে আমারই ছবি আঁকছে।

দৈতরির এখন শোক যাচ্ছে। তাকে বলে এসেছি, 'কোনো দিকে না তাকিয়ে লঞ্চ ঘাটায় চলে যাবি। কাল রাতে ঝড় ছিল। নিশ্চয় একটাও ছাড়তে পারেনি। তেল-জল নিয়ে ছাড়তে ছাড়তে নির্ঘাত বেলা হয়ে যাবে আজ। তার আগে ঘাটে পৌঁছতে পারলে আজুকে পাবি। তোর ময়ুর তা না হলে নদী পেরিয়ে একবার আবাদে গিয়ে পড়তে পারলে আর কোনদিন হদিসও পাবিনে।'

ক্লাসের জানলা দিয়ে দেখলাম, আশু আমাদের কোয়ার্টারের বারান্দায় গিয়ে বসলো। এখান থেকে হাত তুলে ওকে বসতে বলার উপায় নেই। আমি বহুকাল হলো প্রোঃ রায়।

কড়া নাড়তে চোখ মুছতে মুছতে সুকুমার বেরিয়ে এল। আঙুল তুলে কলেজ দেখালো।

ওই এক অভ্যেস ছেলেটার। ভাত-ঘুমের সময়েও দরজা-জানলা আটকে ভেতরটা অন্ধকার করে নেয়। একদিন দুপুরে দোতলার ঘর থেকে নেমে দেশলাইয়ের খোঁজে রান্নাঘরে যাচ্ছিলাম। দেবী সেলাই করছিল কোণের বারান্দায়। রান্নাঘরে যাওয়ার পথে দেখি, মালতীর ঘরের আধ-ভেজানো দরজা বাতাসে কি বেড়ালে হাট করে খুলে দিয়েছে।

মালতী খাটের ওপর হাত-পায়ে ভাঁজ ফেলে বিশাল করে

ঘুমোচ্ছে। ছোকরা খালি গায়ে মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়ে। ঘাবড়ে গেলাম। চারদিকে এখন খুনখারাপির সময়। নাঃ! নিঃশ্বাসে সুকুমার উঠছে পড়ছে। হয়তো রাগারাগি গেছে খানিক আগে। মালতী আর নেমে এসে মান ভাঙায়নি। আমি ওদের ভারত সরকার।

এই যাঃ! গ্যাখো কাণ্ড। আশু যে ক্লাসের জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো।

জানলার নীচেই লম্বা লম্বা ঘাস। সেখানে দাঁড়িয়েই আশু চোখ টিপলো। একক্লাস ছেলে সামনেই বসে। আয়! পুরনো জগদীশ ফিরে আয়! এখুনি তাহলে আমি এক লাফে জানলা গলে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারি। আশু একটা শিশি উঁচু করে দেখালো। ছেলেরা দেখতে পাচ্ছে না তাই। না হলে—

ওরে বাস্! সাপের মাথার মণি নাকি!....

'আজ এই পর্যন্ত থাক—'

কোনদিন লেকচারের মাঝে এমন থেমে যাইনি। ছেলেরা এর-ওর মুখ চাইছে। বাইরে বেরিয়ে এসে প্রফেসরস্ রুমে যাওয়ার পথে আশুকে ডাকলাম। রোদে ঘুরে ঘুরে চোখ লাল। কাছে এসে ফিসফিস করে বললো, 'বস্তর এনিছি বাবু—শঙ্খলাগা বস্তর।'

ঝনাৎ করে মাথার ভেতর রক্ত চলকে এক দিকে উঠে গেল। সেদিন তুপুরের আধো আঁধারে খাটের ওপর ঘুমন্ত বিশাল পাথুরে পুতুলটা নড়ে উঠলো! আয়। জগদীশ ফিরে আয়! আগেকার জগদীশ চলে আয়!

বললাম, 'এখন যাও। ক্লাস আছে—'

'কোথায় যাব বাবু? কদ্দুর থেকে এলাম—'

'যাও না, হরতুকীতলার সেই বাকি সাপটা ধরে ফেল। মাকে ডাকো—মুড়ি খাওগে বসে বসে—আমি হাতের কাজ সেরেই ফিরছি।'

প্রাণিবিদ্যার সেই প্রফেসরকে দেখলেই আমার বিচ্ছিরি লাগে। এঁটুলি তো গরুর কানে, কুকুরের গায়ে হয়। এমন পেছল, ভয়ঙ্কর জিনিসের মাথায় কোন সাহসে এঁটুলি বাসা বাঁধতে যাবে। আজকাল

আমার বড় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, বাড়ি ফিরে কত কি করার আছে!

চারটে সাড়ে-চারটের সময় ফিরে দেখি, তখনো সামনের দরজা আটকানো। আশু ঝাঁপিগুলো পর পর সাজিয়ে দৈতরির দাওয়ায় ঘুমিয়ে আছে। শুকনো হরিতকী পাতাগুলো বিড়ির আগুন পেয়ে ধিকি ধিকি জ্বলছে।

পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে গেলাম।

দেবী সেলাইকলের পাশের পাটিতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। খোলা কাঁচিতে অর্গাণ্ডির কুচি লটকানো। মালতীদের ঘরে গেলাম। কেউ নেই। পা টিপে টিপে ছাদে উঠলাম। খুব গুনগুন করে মালতী গাইছে আর এক-একটা লিটারের কাছে গিয়ে জলের বাটির জল বদলে দিচ্ছে।

খুব আলগোছে কাছে গিয়ে ওর শ্যামল নিকোনো ঘাড়ে একটা লাইটওয়েট চুমো রাখলাম।

পাখি ভয় পেলে যেমন চেঁচায়—প্রায় তেমন করে চিরে ফেললো গলাটা, তারপর বেশ আস্তে করে বলে ফেললো, 'এমন করো কেন জগদীশদা! তোমার তো সব আছে।'

'সব?'

'নেই?' তারপর হেসে ফেললো, 'আমাদের তো কিছুই নেই জগদীশদা—'

'হবে একদিন। তখনো দেখবি চারদিক ফরশা। আসলে কারও কিছু থাকে না শেষ অবধি।'

দু'টি মুরগী একই সঙ্গে কঁ কঁ করে উঠলো।

বললাম, 'তুই এত আমাদের আমাদের করিস কেন?' তারপরেই আমার গলার আওয়াজ গাঢ় হয়ে গেল। বললাম, 'আমি কি খুব বুড়ো হয়ে গেছি তোমার চোখে মালতী?' খেয়াল ছিল না। মুরগী-ঘরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে আমি মালতীকে বুকের কাছাকাছি এনে ফেলছিলাম।

ও খুব যত্ন করে মনোযোগ সহকারে আমাকে এই প্রথম চুমু খেল। শেষে বললো, 'আহা ষাট! কে বললে? তুমি কত ইয়াং!'

ইয়াং কথাটা শিখলো কোত্থেকে! শুনে শুনে বোধহয়।

'তোমাকে ভোলাবার মতো আমার তো কিছু নেই। কোনো অভাব নেই আমার। জ্বর হয় না কখনো যে, বার্লিও করে দেবে। হলেও দৈতরি রয়েছে—দয়া আছে।'

'দয়া?'

'ও কেউ নয়। তোর মামীমা কোথায় রে?' জানতাম। তবু বলে ফেললাম।

'ঘুমোচ্ছে বোধহয়।—সিগারেট আনতে গেল ও। এখনো আসছে না কেন—'

আমি যে আবার ঝুঁকে পড়েছি জানতেই পারিনি। আমার বুকে হাত ঠেসে ধরে আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে রাখতে বললো, 'ওই আসছে—'

'কে?' ফিরে দেখি সুকুমার নয়। দয়া নয়। দেবীর ছেলে রঘু। আমারও। স্কুলের ব্যাগটা পিঠে দুলছে। ফাঁকা রাস্তায় দেশলাইয়ের ফাঁকা খোল কিক্ করতে করতে এগিয়ে আসছে। ওর মুখখানা কি নিষ্পাপ! আমি ওর বাবা। এই ঠিক এই সময়ে ওর চেহারা চোখে ভেসে উঠলে, মনে যা আসে, মুখে যা আসে—যা আর কি প্রাণ চাইলেই করে ফেলতে পারি, বলে ফেলতে পারি—তা আর করা হয় না, করা যায় না। এই জিনিসের নাম ছেলে। রঘুর চিন্তা প্রায়ই আমার রাশ টেনে ধরে।

আমি নেমে গেলাম দরজা খুলে দিতে। বেরিয়ে এসে দেখি, আশু বারান্দায়। জ্যান্ত একটা সাপ ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বসে আছে! হাতে বিড়ি। আমার মুখোমুখি হতেই খুব পুরনো বন্ধুর স্টাইলে বললো, 'এই বুঝি সময় হলো!'

খুব খারাপ লাগল। একজন সাপুড়ে আমাকে চোখ টিপে কথা বললো। 'সাপটাকে আটকাও আশু।'

'আপনার বাড়ির সাপ।'

'তা বলে ছেড়ে রাখবে?'

'থাকুক না ছাড়া। মানুষ দেখলেই তো কামড়ায়—নয়তো গর্তে গিয়ে সেঁধোয়। ফাঁকায় একটু ঘুরুক।'

সুকুমার দু' প্যাকেট সিগারেট হাতে নিয়ে ফিরে এল। আমি বললাম, 'আজ কিন্তু বিকেলের ট্রেনে তোমাকে একবার কলকাতায় যেতে হবে সুকুমার। ওদের পক্সের ভ্যাকসিন নিয়ে আসবে।'

'আমারও একটা কথা ছিল মামাবাবু!'

'পরে বোলো।'

'এখুনি বলে নিলে ভালো হতো।' এত শ্রদ্ধা ওর গলায়—আমার যেন আশি বছর বয়স হয়ে গেছে। নিজেই শুরু করে দিল সুকুমার, 'ভাবছিলাম, ও তো মুরগীগুলো দেখেই—আমি শুধু শুধু অন্ন ধ্বংস করছি বসে বসে—'

ফস করে আশু ছাড়া-সাপটাকে ধরে ফেলে বললো, 'ও নিয়ে ভাববেন না বাবু—যিনি যোগান চিনি—তিনিই—'

ধমকে থামিয়ে দিলাম। ওয়ার্ল্ড এখন যেন আমার কথা মতো চলে থাকে, সেই পোজে বললাম, 'ও সব তোমার ভাবতে হবে না সুকুমার।'

'না মামাবাবু। আমি ক' দিনের জন্যে ঘুরে আসি—'

পেছন ফিরে দেখি দরজা ধরে দাঁড়ানো মালতী। উপন্যাসের ভাষায় যাকে বলে চোখ ছল ছল করছে। মানে, বলতে চাইছে—সুকুমারকে আটকাও জগদীশদা। এত টান।

একটা অদ্ভুত অবস্থা। আশুর হাতে সাপটা আছাড় খাচ্ছে। সিমেন্টের মেঝের ওপর চলাফেরার অভ্যেস নেই। তাই কিছু ক্লান্ত। রঘু মালতীর আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে। মালতীর চোখে জল। সুকুমার কাজ নেই বলে চলে যেতে চাইছে। অথচ আশু এসেছে শঙ্খলাগা বস্ত্র নিয়ে। সঙ্গে শিশিতে বোধহয় সাপের মাথার মণিও আছে।

সুকুমারকে বললাম, 'এখন তো ভেতরে যাও। সন্ধ্যেবেলা যাবে—'

ওরা দু'জনে উপরে উঠে গেল। যা কিছু কথা হয় মুরগীদের সামনে। ওই তিনশো মুরগী ওদের স্বপ্ন হয়ে ওঠা উচিত। মালতীর হয়েছে। কিন্তু সুকুমারের কিছুতেই হচ্ছে না। কেন যে হচ্ছে না, জানি না।

রঘু নড়েনি। আমি ইজিচেয়ারে। আশু পায়ের কাছে। হেসে বললো, 'হরতুকীতলার সেই বাকি সাপটাকেই পেয়ে গেলাম আপনার কথার দিষ্টান্তে—'

'সেই সাপটা? ঠিক সেইটে?'

'হ্যাঁ বাবু। আমার চেনা সাপ। একই চক্কর। সঙ্গীটিকে নিজে হাতে কলেজে বেচে এলাম বারো টাকায়—আমি চিনব না!'

মাঝখান থেকে রঘু এসে কোলে বসলো, 'আমি একটু বসি বাবা!'

আমি ওকে জড়িয়ে নিয়ে বসলাম। আশু ঝাঁপিতে ভরে ফেললো সাপটা, 'হাসা কেউটে বাবু। দিনে দিনে কখনো বেরোবে না। খিদে তেষ্টায় রাতে রাতে একা ঘোরে। ছুবলে ঠোকর দিয়ে কচি শামুক ভেঙে খেয়ে নেবে।

রঘু অনেক দিন পরে আমার কোলে। জাপটে ধরে বসলাম। ওর হাতের শিবলিঙ্গ মাদুলি আমার গায়ে ঠেকলো। আমাদের ভয় কি! আমাদের কাছে শিবলিঙ্গ ফল আছে। আমি সবাইকে নিয়ে বাস করতে চাই। সবাই সুখে থাক। সবার ভালো হোক। কিন্তু এই পৃথিবীতে সাপ আছে। পাপ আছে। মনে বাসা বাঁধে পাপ।

আশু কোমর থেকে একটুকরো লংক্লথ বের করে সামনে মেলে ধরলো, 'আপনার ভাগ্য খুব ভালো। পরশু ভোরে দু'টি জাত গোখরো জড়াজড়ি করে লাট খেতে খেতে একটা চৌবাচ্চায় গিয়ে পড়লো। চুঁচড়োয় নদীর ধারে ধানীপানি গেরস্থ বাড়ি। গোবর সার জমা রাখে বাঁধানো চৌবাচ্চায়। দু' ধার পেছল। পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারে না। লোক জমে গেছে। হাজির হলুম গিয়ে—'

'একটু চা খাবে তো! রঘু, যা তোর মাকে গিয়ে বল—'

রঘু যেতেই আশু বললো, 'জব্বর শঙ্খ লেগেছিল বাবু। ছাড়ানো

যায় না। কে যাবে সামনে। দারুণ বিক্রমে থাকে এই সময়টা। আমি চোবাচ্চায় নেমে পড়ে বস্তরখানা মেলে দিলাম—তবে—'

'তবে?'

'ওরা আর বাঁচেনি বাবু। কত বারণ করলাম। মেয়েটা বড় সতীসাধ্বী ছিল। সহমরণ হলো। এমন পবিত্র বস্তর আর পাবেন না। তের টাকা বারো আনার পরে আরো তিনটে টাকা দেবেন—'

'ওদের কি হলো?'

'হবে আবার কি। সাপ দেখলেই বাবু লোকের খুন চাপে। তাও আরো বাগে পেয়েছে। এক দঙ্গল লোক ইট ছুঁড়েই মেরে দিল। নয়তো ভালো জাতের জিনিস ছিল। জ্যান্ত ধরতে পারলে দু' কুড়ি টাকা হয়ে যেত—'

আশু আমার হাতে কাপড়খানা তুলে দিল। সাধারণ লংক্লথ। কত পবিত্র। এখানে পেতে রেখে যাকে বসাবো সেই বশ হবে। দেবী ঘুমচোখে উঠে এসে বললো, 'সারাদিন পরে কলেজ থেকে এসে তোমার সাপ ঘাঁটতে ঘেন্না করে না?'

দেবীর মুখের দিকে তাকালাম। নিজস্ত্রী-পরস্ত্রী কিছুই মনে হলো না। বড়ই সুন্দরী। নাকের ঘুলঘুলি পর্যন্ত ওর রূপের একটা অংশ। কিছু বেশি নেই কোথাও। কিছু কম নেই কোথাও।

'চা বসিয়েছ?'

'বসাচ্ছি, উনুনে আঁচ নেই। দৈতরি আসেনি। মালতীরা বেরোচ্ছে—'

'দৈতরি ফেরেনি? কোথায় গেল তবে ময়ুর? কোথায় যেতে পারে!'

আশু বললো, 'দৈতরির ভাই তো ময়ুর। দৈতরির মুখে ওর নাম শুনেছি বাবু।' তারপর থেমে বললো, 'গুণে দেখব কোথায় আছে ময়ুর? মানে কোথায় থাকতে পারে?'

আশু জানে না দৈতরির কি হয়ে গেছে এর ভেতর। বললাম, 'না থাক। যার যখন ফেরার ফিরবে।'

আমি, আশু আর রঘু মুড়ি খাচ্ছিলাম। সঙ্গে নারকেলনাড়ু, চা। আমাদের সামনে দিয়ে মালতী আর সুকুমার বেরিয়ে গেল। যাবার সময় মালতী বললো, 'আমি স্টেশন অব্দি পৌঁছে দিয়েই আসছি।'

সুকুমারের দিকে তাকালাম। ও নিজে থেকেই বললো, 'পক্সের ভ্যাকসিন কিনে এনে দিয়ে যাব মামাবাবু।'

'তুমি কলকাতায় গিয়ে এখন এমন কি কাজ পাবে?'

'দেখি চেষ্টা করে—'

'ভালো।'

ওরা দু'জনে চলে গেল। মালতী একটা পাতলা স্যাণ্ডেল পরেছে। হোস্টেলের ছেলেরা ঝুল-বারান্দায় ঝুঁকে পড়ে দেখছে। সিঁদুর দেখলে নিশ্চয় পিছিয়ে যাবে।

দেবী গান গাইতে গাইতে ঘরের কাজে ব্যস্ত। প্রোঃ ঘোষের ছেলেরা এসে দাঁড়াতেই রঘু ছুটে বেরিয়ে গেল।

আশু তখনই শিশিটা মেলে ধরলো। মফঃস্বলের রাস্তায় আর খানিকবাদেই একসঙ্গে লাইটপোস্টগুলোর ডুম জ্বলে উঠবে। 'আসল মণি। একটা আলাদা মাদুলি করে দেবো। তার ভেতরে রাখবেন বাবু। মণি আর মাদুলি নিয়ে আপনার একচল্লিশ-বিয়াল্লিশ পড়বে। আপনার ব্যাপার যখন, চল্লিশ টাকা দিলেই চলবে।'

'অত টাকা তো হাতে নেই আশু। শঙ্খবস্ত্রের দাম, তার ওপর মণি, মাদুলি—একসঙ্গে যে অনেক টাকা—'

'ধীরে ধীরে দিলে হবে। আজ বিশটা টাকা দেবেন। আমি মাদুলি করে দিয়ে যাই।'

আশু ছুরি, রুপোর খোল নিয়ে মাদুলি বানাতে বসে গেল। আমি বস্ত্রখানা হাতে নিয়ে চোখ বুজলাম। আহা। কত নিশ্চিন্ত। এখান! যদি আগে পেতাম। তাহলে—

জীবনে কোনদিন আমার দিকে কেউ ছিল না। আমি অন্যদের দিকের লোক হতে চেষ্টা করেছি সব সময়। হতে পারিনি। লোকে নেয়নি। অথচ এখন সবাই আমার দিকে। এখানকার বাজারে

মুখ ফুটে চাইলে হাজার টাকার জিনিস বাকিতে পেতে পারি। আমি সব জিনিসের দাম জানি। কলকাতায় এক প্লেট মাংস দিয়ে রেস্টুরেন্টে যখন আড়াই টাকা বিল করে—আমি বলে দিতে পারি দোকানদারের আসলে খরচ পড়েছে কত।

আশু আসলে আমাকে তার লাইনে নিয়ে যেতে চায়। বললে যে, এমন মন্ত্র শিখিয়ে দেবে—সারা দুনিয়া তখন আমার বশ হয়ে যাবে। চন্দ্রসূর্যের সমান শক্তি হবে তখন আমার। সারাদিন পরে চোখ টন টন করছিল। শঙ্খলাগা বস্ত্রখানা বুকে ফেলে রেখে চোখ বুজে এসব কথা শুনতে বেশ লাগছিল।

তবে তার আগে নাকি আমাকে একটা কঠিন কাজ হবে। আগামী অমাবস্যার রাতে বস্তার ভেতর একখানা রামদা লুকিয়ে নিয়ে খড়দহের শ্মশানে যেতে হবে। সেখানে একটি মড়া আসবে। তার মুণ্ডুটি কেটে নিয়ে বস্তায় ভরে ফুল্লশ্রীর ধারে নবগ্রহতলায় চলে আসতে হবে। সারারাত্ত নাগাড়ে হাঁটতে হবে। মনে মনে হিসেব করে দেখলাম, না হোক সত্তর কিলোমিটার রাস্তা। আমার পায়ের নীচে আবার কড়া আছে। একটু হাঁটলেই লাগে।

একটা ডিকশনারির ভেতর কিছু টাকা লুকোনো ছিল। খাপে-খোপে, এখানে-সেখানে বিশ-তিরিশ টাকার নোট পাকিয়ে পাকিয়ে ছোট করে লুকিয়ে রাখার অভ্যেস ছাড়তে পারিনি। টাকা আমার জন্যে যেন অন্ধকারে ছায়া মেলে পড়ে আছে। আমি এগিয়ে গেলে তবে ওরা হাতে উঠে আসে।

টাকা এনে আশুকে বিদায় করে ঘরে এলাম। দেবী একা এক জানলার গ্রিল ধরে দাঁড়ানো। খোলা চুল বেয়ে অনেকখানি অন্ধকার মেঝেয় পড়েছে। তাতে আমার পা ডুবে গেল। আমি শঙ্খবস্ত্রখানা আলগোছে বিছানায় পেতে দিলাম। ও তখনো জানলা দিয়ে সবজিক্ষেতের দিকে তাকিয়ে ছিল।

আলগোছে ওর কাঁধে হাত রাখলাম, (একটু কেঁপে ওঠো দয়া) একটুও চমকালো না দেবী। 'অনেক দিন তুমি কোনো কথা বলো না—

'কি আবার বলবো। নাও ছাড়ো।'

'আচ্ছা, তবে একটা গান গেয়ে শোনাও না!'

আমি ওকে মোলায়েম করে ঠেলতে ঠেলতে খাটের ওপর নিয়ে যাচ্ছিলাম। বস্ত্রে বসলে ও কি আর না গেয়ে থাকতে পারবে। তখন আমি যা চাইব তাই দেবে! যা বলব, তাই করবে।

কিন্তু বসার আগেই ও থমকে দাঁড়িয়ে গেল, 'ও কি?'

'ও কিছু না। আচ্ছা বোসোই না ওখানে। কতদিন আমরা পাশাপাশি বসি না।'

যাক্ বাবা! পবিত্র বস্ত্রে বসেছে। আমি পাশাপাশি বসে ওর কোমর জড়িয়ে ধরলাম আলগোছে। কাঁধে মাথা রাখি। হাজার হোক নিজের বিয়ে করা বউ তো। একটু গরম, একটু নরম—কিছু জায়গা খসখসে—কিছু মোলায়েম লাগলো।

'যা-হয় একটা কিছু গাও না। লোকের বউ তো গায়—'

'আমার গান তোমার ভালো লাগবে!'

'এ কি! এ যে একেবারে অন্যভাবে তাকাচ্ছে দেবী। কত নরম করে চোখ খুলে রেখেছে। ঠোঁটে দিব্যি হাসি। প্রায় সুরেলা করে বলে দিল, 'আমি কি গাইতে জানি গান—'

অনেক দিন পরে গলা মেলালাম, 'রাস্তা থেকে ধরে এনে করলে অপমান!'

কি হাসি দেবীর গলায়? ওর মাথার গন্ধতেলের বাস আমায় কাবু করে দিচ্ছিল।

জানলা দিয়ে বিকেলের আলো এসে আমাদের পায়ের ওপর পড়েছে। ওর শাড়ির জরিপাড় এই অন্ধকারে যতটা পারে ঝকমক করছিল। আমি মার্জিতরুচির ধুতি-পাঞ্জাবি পরা প্রোফেসর। আমার নরুণপাড় ধুতির আলো ধরে রাখার কোনো ক্ষমতাই নেই। বললাম, 'তুমি এমন থাক কেন সবসময়!'

'কেমন বলো তো!'

'যেন আমি তোমার কেউ হই না। এ বাড়িতে তুমি বেড়াতে

এসেছ। আমাদের দিকে তাকাও—অথচ তোমার চোখ বলে তুমি অন্য জায়গায় আছ।'

'তাই বুঝি,' বলেই দেবী আমার গলায় হাত রাখলো। মনে মনে বললাম—আশু, জয় হোক তোর। আমার বউ কত বছর পরে নিজে থেকে আমার গায়ে হাত দিল। সরে বসছিল দেবী। আমি আলগা চাপ দিয়ে ওকে শঙ্খবস্ত্রের ওপরেই রেখে দিলাম। ও শুধু আলগোছে হেসে খুব পাতলা করে বললো, 'কি হচ্ছে—'

কি হচ্ছে! এসব এক্সপ্লেন করা যায়? লক্ষ্য করলাম, দেবীর গলায় এমন কতকগুলো শিরা আছে—যার ভেতরের রক্ত চলাচল বাইরে থেকেও খালি চোখে দেখা যায়। আসলে কোনো সুন্দরী মেয়ে বলতে আমি তাই বুঝি। থাকে না অনেকে—যাদের গা দিয়ে আভা বেরোয়—অনেকটা মহাপুরুষের মাথার পেছনের গোল আলোর ছটা।

ও তখন গাইছিল: 'ঝরনাতলায় সকালবেলায়—,' কিংবা ভোরবেলায়।

গানের লাইন আমার মনে থাকে না। কথাগুলোর মানে খুব পবিত্র। এই সবে ভোর হয়েছে। সাক্ষী শুধু গাছপালা। একটা হরিণ এসব কিছুই না বুঝে গলা বাড়িয়ে গাছগাছালির কচি পাতাগুলো খেয়ে নিচ্ছে। ততক্ষণে দেবীর গানে ঘর ভরে গেল। গান শেষও হলো একসময়।

আমরা দু'জনে গানে ডুবে ছিলাম। এমন সময় চটি খুট খুট করে মালতী ঘরে ঢুকলো, 'ওমা, এমন সময় তোমরা ঘরে বসে আছ দু'জনে। আমি ভাবি কোথায় গেলে। খালি বাড়ি। রঘু ফেরেনি?'

আমার খুব খারাপ লাগলো। কিন্তু দেবী খুব সাধারণভাবে বললো, 'তুই বুঝি ভয় পেয়েছিলি! সুকুমার ফেরেনি?'

'ও তো কলকাতায় গেল। কাল কি পরশু পক্সের ভ্যাকসিন নিয়ে ফিরবে।'

'বারণ করলাম—তাও গেল।'

আমার কথায় যেন কি ছিল। মালতী একটু কেঁপে গিয়ে থতমত

গলায় বললো, 'আমিও বলেছিলাম—যেও না। কিন্তু কোনো কাজ নেই বলে ও থাকছে না। বাইরে বাইরে চাকরির চেষ্টা করবে। পেলে ভালো। না হলে তো ফিরে আসবেই। ততদিনে মুরগীগুলো বড় হয়ে উঠবে।'

দেবী আমার গলার ঝাঁজ টের পেয়েছিল। মালতীকে সরিয়ে দেবার জন্যে বললো, 'যা তো, কফি করে নিয়ে আয় তোর মামাবাবুর জন্যে।'

মালতীর এখন আগাগোড়া ভরভরাট ভাব। নিজস্ব স্বামী—বিশেষ করে দু-দুটো বিয়েয় পাওয়া একমাত্র স্বামী, তাকে নিয়ে অন্যের কাছে আর কাঁহাতক কৈফিয়ত দিতে ভালো লাগে। টান টান বেণী, কাটপিসের আঁটো ব্লাউজ, ঘাড়-গলা পাউডারে মেজে নিয়ে সুকুমারের সঙ্গে বেরিয়েছিল। সেই অবস্থায় সন্ধ্যের ঘোরে মালতী রান্নাঘরে গেল।

'তুমি সবাইকে বড় বকে কথা বলো। কি দরকার! ওরা যা ভালো বুঝবে করতে দাও—'

আমি দেবীকে আর কিছুই বললাম না। আমি জানি, সুকুমার যদি আর বাহাত্তর ঘণ্টার ভেতর ভ্যাকসিন না নিয়ে ফেরে তাহলে পক্সে যে কোনো সময় এতগুলো বার্ড কাবার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু দেবীর দয়ামায়া, স্নেহভালোবাসা সবসময় এতই বেশি যে, বেশির ভাগ জায়গায় আমিই ক্যাজুয়ালটি হয়ে যাই। ও একবারও ভাবলো না, আমার কি কি ক্ষতি হতে পারে।

দেবী উঠে দাঁড়িয়েছিল। আমি শঙ্খবস্ত্রখানা ভাঁজ করে ওর উল্টোদিকের চেয়ারে পেতে দিলাম।

বললাম, 'বোসোই না চেয়ারে। কাজ তো সবারই থাকে।'

'না, আমি অন্ধকারে বসে থাকতে পারছি না। রঘু এল। এখুনি চিলেকোঠায় যাবে—'

আমি প্রায় ধাক্কা দিয়ে ওকে চেয়ারের ওপর শঙ্খবস্ত্র চেপে বসিয়ে দিয়েই বললাম, 'যা বলছি শোনো। তোমাকে শুনতেই হবে। অমাবস্যা কবে জানো?'

দেবীর ভেতরে ভেতরে কোথায় ঘা দিয়ে ফেলেছি তখন তা বোঝার মতো মন আমার ছিল না। ও যে কেঁদেছিল, অনেক পরে তা জানতে পারি।

'আমি কি করে জানব! বাংলা ক্যালেণ্ডার একখানাও বাড়িতে রেখেছ!'

'আমি সেদিন খড়দহের শ্মশানে যাব। একটা বস্তা আর রামদা নিতে হবে।'

'কি হয়েছে তোমার বলো তো!'

'কিছু হয়নি। ওদিন রাতে একটা মড়া আসবে তার মুণ্ডুটা এককোপে কেটে নিয়ে আসতে হবে। তারপর—,' আমি ততক্ষণে হা হা করে হাসতে শুরু করে দিয়েছি। যেন কতবড় একটা বিজয়সিংহমার্কা কাজ করে বসে আছি।

'কি হলো তোমার ওগো?'

'এখনো কিছু হয়নি। হবে। সারা তুনিয়া বশ হয়ে যাবে। তুমি আমার বশ হয়েছ এখন।

'কি বাজে বকছ!'

'মোটেই না। তুমি বশ হয়ে কতকাল পরে ধরা দিলে। আচ্ছা তুমি একখানা হাত ওপরে তুলে ধরো—'

'কি হবে?'

'ধরো বলছি '

'ধরেছি।'

'এবার বলো কাকে তুমি ভালোবাস!'

'কি পাগলামি হচ্ছে! রঘু খাতাপত্তর নিতে এখুনি চলে আসবে। মালতী রয়েছে—'

দেবী হাত নামিয়ে নিচ্ছিল। ধমকে উঠলাম, 'এবারে বাঁ হাতখানা মাথার ওপরে তুলে ধরো। ধরেছ! ব্যাস। এবার বলো কাকে তুমি ভালোবাস। ঘন ক্ষীরের মতো ভালোবাসা তুমি কাকে দাও? দৈতরির বউয়ের মতো কোনদিন ভেগে যাবে না তো!'

'ছিঃ। তুমি আর মানুষ নেই।'

'আছি বলেই এসব কথা বলছি। নইলে মাথাই ঘামাতাম না।

এমন সময় মালতী ট্রেসুদ্ধ কফি নিয়ে ঢুকলো, ওকি 'মামীমা, অমন করে দাঁড়িয়ে আছ!' মালতী আলো জ্বেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে দেবী তার কাপে কফি ঢেলে নিয়ে চোখে আঁচল চেপে বেরিয়ে গেল। তখন শুধু মালতী আমার সামনে।

'কি হচ্ছিল জগদীশদা? মামীমার মতো মানুষের মনে দুঃখ দিলে তোমার সর্বনাশ হবে।'

'আমার সর্বনাশ অনেক আগে হয়ে বসে আছে। তুই এসে ষোল-কলা করে দিলি। আচ্ছা বল তো অমাবস্যা কবে? জানিস?'

'শুক্কুর শনিবার হবে বোধহয়। শনিবারটাই অমাবস্যার পক্ষে ভালো মানায়। বেশ বিপদ-আপদের গন্ধ থাকে শনিবারে।'

'সেদিন তুমি আমার সঙ্গে একজায়গায় যাবে?'

মালতী চেয়ারে পাতা শঙ্খবস্ত্রের ওপর বসে পড়লো অজান্তে। আমার মুখে হাসি বেরিয়ে পড়ছিল। এক চুমুকে কফি মেরে দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিলাম। ওর কপালে চুমো দিয়ে বললাম, 'খড়দহের শ্মশানে। বেশ দু'জনে একসঙ্গে যাব। তুই গাছতলায় বসে থাকবি। একটা মেয়ে মড়া আসবে। এককোপে তার মুণ্ডুটা কেটে নিয়েই ফিরে আসব।'

'তার চেয়ে আমার মাথাটা কেটে নাও। সত্যি বলছি জগদীশদা।' খুব আলগোছে মালতী ওর বুক আমার গায়ে চেপে ধরলো, তারপর অন্ধকারে আন্দাজে আমার কাঁধে চুমো খেতে গেল। ভীষণ জোরে। দাঁত বসিয়ে দিচ্ছিল আরেকটু হলে। চিলেকোঠায় দেবী রঘুর কবিতা মুখস্থ নিচ্ছে বোঝা গেল। শঙ্খবস্ত্র কি জোরালো, এবার বুঝছি। জগদীশ রায়ের কোমর থেকে বুক অবধি মালতী জড়িয়ে ধরেছে, 'আমার আর ভালো লাগছে না। সবসময় সন্দেহ। আমি যেন সতী থাকি—আমি যেন সতী থাকি—এই একমাত্র চিন্তা

সুকুমারের। আচ্ছা তুমি বলো জগদীশদা—আমি সতী না? আমি 'ওর জন্যে কী না করি!'

অন্ধকারে আমার বুকের ভেতর অবধি কেঁপে গেল। খুট করে সুইচ টিপে দিলাম। একজন খুব চিন্তিত আলুথালু রমণী দিক হারিয়ে চেয়ারে বসে আছে। আজই বিকেলে পাউডারে আচ্ছা করে ঘাড়-গলা মেজে নিয়ে এই মালতীই সুকুমারকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছে।

'দরজা খোলা রাখিস। দেখো ঘুমিয়ে পোড়ো না যেন—'

মালতী এবারে উঠে দাঁড়ালো। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এই প্রথম বুঝলাম, আমি দ্বিধায় পড়েছি। মালতীকে তুই ডাকবো না তুমি? কোন্‌টা ঠিক। আমি ওর পাতানো মামা কিংবা দাদা! নয়তো গোপন প্রেমিক। অথচ আমি তো আমার স্ত্রীকে ভীষণ ভালোবাসি। তবে আমি ওর কাছে যাই কেন? কিছু নতুন বলে। কিছু অন্যরকম। কিংবা আমাদের পরেকার মানুষ কেমন হয়ে থাকে তাই জানতে—ডুবে গিয়ে বুঝতে?

চেয়ার থেকে বস্তরখানা তুলে নিয়ে আমারই শিয়রের বালিশের নীচে পাট পাট করে ভাঁজ করে রেখে দিলাম। খেতে বসে রঘুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাঁধাকপির ডালনা খেলাম অনেক। মালতী পরিবেশন করছিল আর হাসছিল। যেন ওরই স্বামী, ওরই ছেলে খেতে বসেছে। দর্শক হয়ে পাশে বসেছিল দেবী। ডান চোখের পাতা ঘন ঘন নাচছে ওর। যখন প্রায়ই পলক পড়ে ওর—আমি টের পেয়ে যাই। ও তখন আঙুল মটকায়। কোনো বিপদ আসছে বুঝতে পেরে সারাটা মুখ বিষণ্ণ করে ফেলে। তখনই ও আমাদের চেয়ে আলাদা হয়ে যায়। প্রায় যেন একটা উঁচু মঞ্চে উঠে যায়। সেখান থেকে আমাদের দেখতে পায়। আমাদের তাকানো ওকে ছুঁতে পারে না।

মাছের ঝোলের সময় এলাকা সুদ্ধ আলো ফিউজ হয়ে গেল। দেবী উঠে গিয়ে মোমবাতি খুঁজতে গেল। রঘু ভাতের থালার পাশে জবুথবু হয়ে বসে। আমি মালতীর গায়ে হাত রাখলাম। নড়লো না। এর নাম সুখ। এর নাম পাপ।

তার মাঝখান দিয়ে যেন কোনো যাজ্ঞিকার মতো মোম ধরিয়ে দেবী ফরে এল। আমরা খেয়ে উঠলে ওরা দু'জন খেতে বসবে।

আমি জোড়া বালিশে শুই। বালিশের নীচেই ছিল শঙ্খবস্ত্র। সেদিন রাতে আমরা খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম। সাধারণত পড়ি না। আমি ও আমার স্ত্রী খুব সাবধানী। ও আজ চার-পাঁচ বছর ফি মাসে বাইশটি করে পিল খায়। রঘুর বছর-দুই বয়স পর্যন্ত রাতে শুয়ে শুয়ে দেবী কতবার বলেছে, এবার একটি মেয়ে হলে খারাপ হয় না। আমিই এগোয়নি। কি দরকার আবার ! নানান ঝামেলা। ইদানীং দেবীই আর এগোতে চায় না। বলে, এখন হলে আর মানুষ করতে পারব না। আমার আর ধৈর্য নেই বাপু।

আমাদের কোয়ার্টারের বারান্দায় সিমেণ্টের বেঞ্চে সুকুমার এসে বসতে গেল। একাদশী কি দ্বাদশী হবে বোধহয়। ক্ষয়াটে চাঁদ। বারান্দায় গাছপালার ম্যাড়মেড়ে ছায়া পড়েছে। আমি শঙ্খবস্ত্রখানা পেতে দিলাম, 'এর ওপর বোসো।'

'কি জিনিস মামাবাবু? ৩০১ নম্বর রুমাল?'

'একেবারে খাঁটি দিশী জিনিস। বসেই দেখ না। একদম আমার বশ হয়ে যাবে!'

'আমি তো আপনার বশ হয়েই আছি। আমার তো যাওয়ার আর কোনো জায়গা নেই—'

আমি জবাব দিলাম না কোনো। ওকে একরকম জোর করে বস্ত্রের ওপর বসালাম। হঠাৎ একখানা মেঘ এসে পুঁচকে চাঁদটাকে ঢেকে দিল।

এবার বললাম, 'মাথাটা নীচু কর তো সুকুমার।'

'করেছি। কিন্তু কি করবেন বলুন তো। একদম বুঝতে পারছি না।'

তোমার মুণ্ডুটা নেব। আমার একটা মুণ্ডু দরকার। আগুর কাণ্ড! কে আবার যাবে খড়দহের শ্মশান পর্যন্ত। এই ভালো না! বেশ নিজেদের মধ্যে—'

'মুণ্ডু দিয়ে কি করবেন মামাবাবু?'

'সে অনেক কাণ্ড, তুমি বুঝবে না। তোমার যা দেওয়ার দিয়ে দাও তো—'

আমার আর তর সইছিল না। রামদাখানা বেশ ভারি। বেশি-ক্ষণ হাতে ঝুলিয়ে রাখা যায় না।

'নেবেন নিন্। কিন্তু তার আগে মালতীকে আপনার ছেড়ে দিতে হবে—'

ঝোলানো রামদা ঘচাং করে পড়ে গেল। আর একটু হলেই সুকুমারের মাথাটা নিয়ে পড়তো। আমি জেগে গেলাম। রঘু আমার বুকে পা তুলে দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। তাই দম আটকে আসছিল। সাবধানে ওর পা নামিয়ে দিয়ে দেবীর চাদরখানা গলা পর্যন্ত টেনে দিলাম।

তারপর তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম।

দরজা আটকানো। তার ভেতর দিয়ে সামান্য আলো বেরিয়ে এসে লবিতে পড়েছিল।

মালতী দরজা খোলা রাখতে ভুলে গেল!

'মানুষের ব্যর্থতার সীমা একটি ঘটনা থেকে পরিস্ফুট হয় যে, আমেরিকার মতো বিজ্ঞানগতভাবে অগ্রসর দেশে যেখানে মুরগী-শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, সেখানে তার মৃত্যুর হার বাড়তির পথে। ১৯২০ সালের শতকরা ১০ পারসেণ্ট মৃত্যুর হার গিয়ে পৌঁছায় ১৯৩০ সালে ১৫ পারসেণ্ট, ১৯৩৪ সালে ২০ পারসেণ্ট, আর ১৯৩৭ সালে ২৪ শতাংশে। একটা মোটামুটি রক্ষণশীল হিসাবে ১৯ থেকে ২ পারসেণ্ট মৃত্যুর হার সমস্ত জাতটাকে ২০,০০০,০০০ ডলার লোকসান করিয়েছে।'

মনে মনে হিসাব নিলাম: অর্থাৎ এখনকার অঙ্কে পনেরো কোটি টাকা।

দ্বাদশ অধ্যায় মুরগীর ব্যাধি নিয়ে। ব্র্যাকেটে লেখা Disease of the Fowl। বইখানার মলাটে ছ'টা ডিমের ওপর একটা মুরগী চড়ে বসে আছে। খুব মন দিয়ে লেখা বই। ছাদে কঁ-কঁ আওয়াজে বসা যায় না। ভোর থেকে কিছুতেই মন বসাতে পারছি না।

মালতী মাথা নীচু করে কফির কাপ রাখলো। তারপর চামচ দিয়ে ঘুঁটে দিল।

'দেবী কোথায় ?' আমিও অন্যদিকে তাকিয়ে জানতে চাইলাম। মুখোমুখি তাকানো যাচ্ছিল না।

মালতী খুব আস্তে কি যেন বললো। শুনতে পেলাম না। ফিরে বললাম, 'কোথায় ?'

খুব ভোরে ফুল্লশ্রীর দিকে গেছে—'

'একা একা ?'

মালতী কোনো জবাব না দিয়ে ভেতরে চলে গেল। আমার ভেতরটা তখন খচখচ করে উঠেছে। এত ভোরে দেবী একা একা নদীর ধারে কেন গেল !

কাল রাতে আমি যখন বিছানা ছেড়ে নামি, ও তো তখন ঘুমে অচেতন ছিল।

কাল নিশুতিতে আমি কি কি করেছি !

মালতী টিমে আলোটা নেভাতে ভুলে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। দরজা আটকানো। কয়েকবার টোকা দিলাম। কোনো আওয়াজ নেই। দূরে মালগাড়ির শান্টিং এখন দিব্যি পরিষ্কার শোনা গেল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার শীত ধরে যাচ্ছিল। শেষে বাইরের দরজা খুলে বাগান দিয়ে মালতীদের ঘরের জানলার নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম। শুকনো পাতা পায়ের নীচে পড়ে খচমচ করে উঠলো। শব্দ করার কোনো উপায় নেই। যদি জেগে উঠে দেবী একবার জানলা দিয়ে তাকায় !

বাগানের ফলপাকুড় পাড়ার আঁকশিটা দিয়ে জানলায় ঠুক ঠুক করে ঘা দিতেই কবাট খুলে গেল, জিরো পাওয়ারের আলোটা জ্বলছে

ঘরে, তার ভেতরে ফোলা ফোলা চোখে মালতী মুখ বের করলো, 'সত্যি সত্যি এসেছ! বাগানে দাঁড়িয়ে। ধন্যি বাপু!'

আমি মরে গেলাম। আমার লোভের সঙ্গে আমার সোজাসুজি দেখা হলো। এইভাবে খুব ছোটবেলায় আমাদের কোন্ দিদি যেন তক্কি দিত। ঠিক এইভাবে ডেকে ডেকে—বকে বকে।

খুট করে দরজা খুলতেই ভেতরে চলে গেলাম, 'এ কি, তোমার গা গরম কেন?'

'ও কিছু না। আচ্ছা জগদীশদা, তোমার তো অমন ভালো বউ আছে। তবু?'

আমার কথা বলার সময় ছিল না। আমরা পৃথিবীতে আসার অনেক পরে এরা এসেছে। এরা কেমন হয় জানি না। আমরা যখন খুব কাছাকাছি, তখন লোকে কি করে কথা বলে জানি না। মালতী আবার বললো, 'আমার সব ব্লাউজ ছিঁড়ে গেছে। বেরোবার শাড়ি বলতে কিছু নেই আর—'

'তুমি মধু। তোমাকে আমি সব দেবো।'

'পরে ভুলে যাবে। হাতে একটাও টাকা থাকে না। কোথাও যে একটু যাব তারও উপায় নেই—'

এখন লোকে এত কথা বলতে পারে! বুঝলাম, মালতীর কিছুই হয়নি। বললাম, 'সুকুমার তো ওষুধ কেনার নাম করে মাঝে মাঝেই টাকা নিয়েছে। তোমাকে দেয়নি?'

'ওর কথা আর বোলো না। দিনে সিগারেট চাই তিন প্যাকেট—'

আর কথা বলা যাচ্ছিল না। ঘোরের মধ্যে বললাম, 'তবে কি দেখে বিয়ে করলে?'

'আমার যে কিচ্ছু ছিল না। আমি যে কোনদিন কিছু পাইনি।'

শীত করছিল। বেরোবার সময় বললাম, 'আমার বৌ হয়ে থাকবে?'

'ছিঃ! তা হয় না। আমাকে নিয়ে কেউ সুখী হয় না।'

তখনো আমার শীত যায়নি খুব কাটা-কাটা করে বললাম, 'তাকাও তো। কে বেশি ভালো—আমি না সুকুমার?' বলে আমারই লজ্জা করছিল। অনেকদিন আরামে থেকে, স্টার্চ মুখে একদম না তুলে আমি বেশ ফিটফাট, তাজা দেখতে—এ তো আমি নিজেই জানি।

'কেন এসব বলছ জগদীশদা! তুমি বরং এমন করে আমার কাছে আর এসো না।'

আমি হেসে ফেললাম। তখনো ও বলছিল, 'যে করে পারো ওকে ফিরিয়ে আনো।'

'আনবো। তার বদলে তোমাকেও আমাকে নিতে হবে। আদি জানি না মালতী, আমি রোজ কোথায় চলে যাচ্ছি—'

'তা কি করে হয়। তুমি তোমার জায়গায় থাকো।'

মালতীকে বোঝাই কি করে যে, আমার একটা অতীত ছিল। সেই অতীতের নাম এখন বিস্মৃতি। আমি ফিরে তাকিয়ে তার ভেতর থেকে কিছুই তুলে আনতে পারি না। আমার কাছে ভোরের আলো, চারাগাছের শেকড় ছড়ানো—সবই নতুন, সবই আনন্দের। এসব আমি বেশি বয়সে আবিষ্কার করেছি বলে বড় বেশি করে জড়িয়ে ধরছি। একই আনন্দে আমি তোমাকে চাই মালতী।

কিন্তু এসব কথা বলা যায় না। উপরন্তু একটি তেইশ-চব্বিশের মেয়ে আমার সামনে খাটে শুয়ে আছে। একখানা পা ভাঁজ করে তোলা। যাদুঘরের বাইরের বাগানে এভাবেই কত যক্ষমূর্তি শোয়ানো থাকে দেখেছি।

'আমাকে তোমার ভালো লাগে না মালতী?'

'খুব। কিন্তু তা হয় না। তাহলে ও মরে যাবে—'

ওই ছেলেটা। যে আজকে কলকাতা চলে গেল। আমি বুঝি না ওর মধ্যে কি আছে। আমি বুঝি না আমার মধ্যে কি নেই।

এরা জ্ঞান হয়েই কলকাতা দেখছে। আমরা দেখিনি। আমরা দূরে ছিলাম।

রঘুর সঙ্গে আজ আমি খেতে বসলাম। ও যে কেমন ছেলে আমি বুঝি না। বিয়ের পরে ছেলে হয়—ঠিক সেইভাবে হয়ে গেছে ও। কোনো ভাবনা-চিন্তা ছিল না। এখন দেখছি ওর চোখে দেবীর চোখের ছায়া।

বললাম, 'আর দুটো ভাত নিবি ?'

মালতী পাশে দাঁড়িয়েছিল।

'মা কোথায় ?'

'বেড়াতে গেছে—', বলে আমারও চোখে জল আসছিল। স্বাধীনভাবে কান্নারও পথ নেই। সাক্ষী ছেলে। সাক্ষী মালতী। আমার গোপন আসক্তি সুখ বা পাপ। অবশ্য আগাগোড়া সাবান দিয়ে চান করে ফেললে অন্য কথা।

রঘুকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ফুল্লশ্রীর দিকে গেলাম। লোকালয় ছাড়িয়ে আর ছাত্রদের সঙ্গে, অভিভাবকদের সঙ্গে দেখা হওয়ার ভয় নেই। এখানে-সেখানে নদী সরে গিয়ে শুকনো গইমুখ তৈরি করে ফেলে রেখে গেছে। সেসব জায়গায় শ্বেত আকন্দ নয়তো খুদে বাবলার ঝাড়। গাঙ-শালিখরা তার ভেতরে পোকা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

দেবীকে পেলাম একটা উঁচু-মতো ঢিবির ওপরে। পেয়ারার মোটা গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে ছিল। আমি এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করলাম কয়েকবার। গভীর ঘুমে দেবী। বেলা মোটে এগারোটা। চোখের নীচে কালি। নাকের পাটা উঠছে নামছে। বড় মনোহারী। ভাঙা বেণীটা বুকে এসে আর পথ পায়নি। জরদ রঙের শাড়ি, পেয়ারা গাছের পিছল ফ্যাকাশে হলুদ গা, নদীতে একটাও নৌকো নেই। কোনো পরী যেন কাল শেষরাতে পৃথিবীতে নেমে পড়ে ফিরে যাবার কলাকৌশল সব ভুলে গেছে। লোকালয় জেগে ওঠার আগে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙলে আর যেতে পারবে না।

আমি চারদিক তাকিয়ে নিয়ে একটু দূরে হাঁটু ভেঙে বসলাম,

তারপর মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে দেবীকে গড় হয়ে নমস্কার করলাম। একটা চিল কারও হাঁসের ছানা নিয়ে পালাচ্ছিল। বহু উঁচু থেকে সেটা শব্দ করে দেবীর পায়ের কাছে পড়লো।

উঠতে যাচ্ছিলাম, জেগে গিয়ে দেবী বললো, 'করছ কি ?'

'কেন! প্রণাম করছি।' হাঁসের ছানাটা তিরতির করে পালালো।

'ছিঃ! ছিঃ!'

আমার আরও ভালো লাগলো। ও যে আমাকে ঢিবির ওপর বেশ উঁচু থেকেই ছুয়ো দিচ্ছে—এটা বেশ সুখের। কেননা, আমি তো পাপী। আর কত কনসেসন দেবো নিজেকে। কতবার ভেবেছি, মালতী, এই তোমার সঙ্গে শেষবার—আর নয়। তবু আবার—

দেবী শাড়ির পাড়ে পায়ের পাতা ঢেকে নিচ্ছিল। উঠে দাঁড়াতে যাবে। আমি ছুটে গিয়ে বসিয়ে দিলাম, 'বেশ তো ছিলে বসে। একেবারে ঢালা ফুলের সাজি—'

'কবিতা রাখো। ছাড়ো বলছি—আমার ভালো লাগে না।'

'আমাকেও না!'

'মোটেই না।'

'আমার যে লাগে—'

দেবী চুপ করে থাকলো। বললাম, 'জানো দেবী, তোমার একটা নাম আছে আরও—'

ও সেসব কথায় কান না দিয়ে দিব্যি উঠেই হাঁটতে লাগলো। আমি পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বললাম, 'আমি তোমায় মনে মনে দয়া বলে ডাকি।' ও হাঁটছিল। আমি বলেই যাচ্ছিলাম, 'তোমার মধ্যে ক্ষমা আছে। খুব ঘন ক্ষমা। তাতে একটা পাথর ছুঁড়ে মারো। ধীরে ধীরে ডুববে—'

আমি আমার ভেতরটা আগাগোড়া ঝাঁকুনি দিয়ে তলানির সব কথা, সব চাপা গুমোট একেবারে ওপরে ভাসিয়ে তুলছিলাম, 'আমি অনেক পাপ করে ফিরে এসেছি। এবার তোমার মন্দিরে এসে

সবকিছু গল গল করে বলে দিয়েই খালাস—আর কোনো বোঝা বইতে হবে না আমাকে—'

ঘচ্ করে দেবী থেমে গেল, 'আচ্ছা তুমি কি এই পৃথিবীর মানুষ নও? সারাদিন মনে মনে কোথায় থাক? কোথায় কাটাও?'

আমি মরমে মরে গেলাম। আমি যে খুবই এই পৃথিবীর লোক। সামনের অমাবস্যায় একটা মুণ্ডু কেটে আনতে হবে এককোপে। কাল রাতে মালতীর জানলার নীচে এই আমিই ছিলাম। ভাগ্যিস সময়ের নানান দরজায় কালো পর্দা টানানো থাকে। নয়তো সব একাকার হয়ে যেতো।

'তুমিও তো আমাকে ছাখো না মোটেই।'

'কি দেখব! সব কাজ নিজে করে, নিখুঁতভাবে করে নিজের গর্বে ঘুরে বেড়াও। তোমার কোথাও ফাঁক নেই যে, খাদ মিশিয়ে সুখ পাব। কিছু করে দিয়ে মিশে যাব।'

দেবীর ভেতর থেকে স্বয়ং দয়া বেরিয়ে এসে কথা বলছে, বুঝতে পারছিলাম।

'একি! আমরা কোথায় এলাম?'

ও বললো, 'সেকি, চেনো না তুমি! এ যে ফুল্লশ্রীর শ্মশান। সেবারে সুকুমারের জন্যে সঙ্কল্প করে গেলাম। দৈতরি এসেছিল সঙ্গে—'

এদিকটায় কোনদিন আসিনি। লোকমুখে শুনেছি শ্মশান আছে। নদীর ওপারে কারা মড়া পুড়িয়ে ফিরছে। কাদা মাখিয়ে নাইকুণ্ডটা মাঝনদীতে ছুঁড়ে দিল একটা ছেলে। বারো-চোদ্দ বছর বয়স হবে। ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুকটা। রঘু একা একা স্কুলে গিয়ে ফিরে আসবে তো।

দেবী একা এগিয়ে গিয়ে অশ্বত্থতলায় সিঁদুর মাখানো কি এক ঠাকুরের পায়ের কাছে আঁচলের খুট খুলে পয়সা দিল। আশ্চর্য, এর মধ্যে তিন চার মাস কেটে গেল। এইতো সেদিন দৈতরির সঙ্গে ওরা এসেছিল। ক'দিন হয়ে গেল দৈতরি ফেরেনি।

শ্মশানে এখন আর কেউ নেই। শুধু আমি আর দেবী। আর আমার হাতের মাদু'লির ভেতরে সাপের মাথার মণি।

কত বছর এই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কেন? শুধু একটাই তো কথা। আমি কতটা দখল করতে পারি। কতখানি জয় করতে পারি। এখন আমরা কে কা'র বশে। ছোটবেলা থেকেই দেখছি, আমার চারদিক নির্জন হয়ে গেলে আমি এখানে-সেখানে টোকা দিয়ে দেখি—আসলে আমার কতটা, তাই বাজিয়ে দেখি। কিংবা তখনি আমার স্বাধীনভাবে খারাপ কিছু করার ইচ্ছে হয়।

চারদিকে রোদ্দুর। তার ভেতরে গাছতলার এই জমাট ছায়ায় দেবী মাথায় ঘোমটা তুলে দিল, তারপর ঝুরি-নামা শেকড়ের আড়াল-আবডাল কাটিয়ে সেই ঠাকুরতলায় ভক্তিভরে গড় করলো। তখনো ওঠেনি। আমি ডাকলাম, 'দয়া!'

ও চোখে শাসন করে কাছে উঠে এল, 'কি হচ্ছে! বয়স নেমে যাচ্ছে রোজ রোজ—'

আমি কথা বলতে পারলাম না। আমার এমন বউ। বোধ হয় আমার নয়। অন্য কারও পরিবার নির্ঘাত। কাছেপিঠে কোনো লোক নেই। সেই শ্মশানযাত্রীরা ওপারে খেয়া ঠেলে দিয়ে পাড়ে উঠছে।

'যায় যাক। কোনদিন তোমাকে আমি এমন করে পাইনি দয়া!'

ও অবাক হয়ে আমার চোখে তাকালো। ঠিক তখনি পুরনো জগদীশ জেগে উঠতে চাইলো। আমি ঠিক করলাম, দেবীকে এখন গুণ করবো। আশু বলেছিল, ঠিক দুপুরে শ্মশানে-মশানে মাদুলি মুঠি করে ধরে দক্ষিণ আকাশে তাকাতে হবে। তারপর নিঃশ্বাস বন্ধ করে একদমে মনে মনে বীজমন্ত্র আউড়ে গেলেই আমাদের জানাগুলো আকাশ, পথঘাট, মায়া-মমতার ওপরকার এক পরত খোসা উঠে গুটিয়ে যাবে।

তখন আসল আকাশ, খাঁটি ভালোবাসা, রিয়েল নদী বেরিয়ে পড়ে।

দেবী আজ বোধ হয় কোনো সঙ্কল্প করে ভোরে একা একা ফুল্লশ্রীর দিকে বেরিয়ে পড়েছিল। যে ঘোরে ও বেরিয়েছিল—তার ঠিক উলটো মুখে এখন হাওয়া। ভীষণ নরম হয়ে আমার পিঠে হাত রেখে বললো, 'উঠবে না? ভোরে চা দিয়েছিল মালতী!'

আমার তখন কিছুই কানে যাচ্ছে না। সব কিছু আসল করে ফেলার জন্যে আমি দক্ষিণমুখো হয়ে এক নিঃশ্বাসে বীজমন্ত্র পড়ছি মনে মনে। এক্ষুনি আকাশ গুটিয়ে ফেলবো। নদীর ধারের শ্মশানের বুক থেকে ধুলোর ঝড় উঠে চৌদিক অন্ধকার করে দিচ্ছিল যেন। কোন্ গর্তে এক সাপ থাকতো। অমাবস্যার নিশুতি রাতে মাথায় মণি জ্বালিয়ে সে মাঠের ভেতর দিয়ে যেত। শুকনো খালের বুক বেয়ে ওঠার সময় সেখানকার অন্ধকার খানিকক্ষণ ফিকে হয়ে যেত। সেই মণি এখন আমার মাদুলিতে। আয়! আগেকার জগদীশ ফিরে আয়!

হঠাৎ মনে পড়লো, আমাদের ছোটবেলায় এক হেরিকেন ঘিরে ভাইরা সবাই পড়তে বসতাম। চিমনিতে কাচের সাদা উলকি ফুটিয়ে লেখা ছিল: ১নং আসল ধূমকেতু।

আশ্চর্য, এতদিন পরে সেই চিমনি দিয়েই আমার চোখের সামনে ধোঁয়া বেরিয়ে চারদিক ঝাপশা করে দিল। একজন ধোঁয়াটে দয়া তার ভেতরে দাঁড়ানো। আমার মন সরে যাচ্ছিল। মুহূর্তে একটা ঝাকড়ামতো শিরীষ গাছ বাতাসে তার ডালপালা ভেঙে ফেলে শূন্যে উঠে গেল। বহুদূর অবধি শেকড় উপড়ে নিয়ে ওঠায় মাটি ফাটিয়ে ফেললো অনেকটা। আবার সেই ১নং আসল ধূমকেতু। বিরাট চিমনির ওপারে বারো বছরের বড়দা পা গুটিয়ে বসে অঙ্ক কষছে। আমি স্লেট মুছলাম দু'বার। উঃ! আবার মন সরে যায় ছাখো। শ্মশানযাত্রীদের চটিতে ছাদ বলতে আর কিছু নেই। দু'খানা মোটে টিন টিকে আছে।

আমি মন জড়ো করে নিলাম। ওঁং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ ভর্গোদেবস্য ধীময়ী........

দয়া, তুমি আমার চোখের সামনে থেকে সরে যাও। আমি কোনো মন্ত্র জানি না। আমি জানি, আমি যেন আর অসৎ না হই। সুখ ভালো। পাপ ভালো নয়। অথচ সুখ আর পাপ সব জায়গায় মিলেমিশে মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে।

যথা প্রিয়য়া স্ত্রীয়া সংপরিষক্ত........

কোথায় পড়েছিলাম! এবারে আমি দয়াকে গুণ করে ফেলবো। দক্ষিণের আকাশ ফিকে হয়ে গেল। মাঠের ঘাসগুলো ঝাঁ ঝাঁ করে বেড়ে উঠে চারদিক সবুজ মখমল করে দিল। একটা কালো ছাগল ভেতরে গলে গেল। আর দেখা যাচ্ছে না। খানিকক্ষণ হলো বাতাস দেখা যাচ্ছে চোখে। গাঢ় হলুদ রঙের।

তখন দয়াকে বললাম, 'তুমি এত ভালো কেন? আমি কে? আমি কেমন তুমি তা জান?'

সেই রমণী কোনো উত্তর দিল না। স্রেফ আমার পিঠে হাত রেখে উঠে বললো, 'কাল রাতে বিশেষ ঘুমোওনি। ওঠো এবারে—'

'তুমি জেগে ছিলে?'

দেবী চুপচাপ। আমি মাদুলিটা লাগাতে গেলাম ওর গায়ে। ওর ডান হাতের কনুইয়ের নীচে মাদুলিসুদ্ধ আমার হাত গুটিয়ে গেল। কি নরম, সুডৌল, কোনো কালো দাগ নেই—মানুষেরই মনে হয় না। একেবারে ভগবানের অ্যারেঞ্জমেণ্ট। মাদুলির বদলে সেখানে আমার ঠোঁট রাখলাম।

পৃথিবী কোথাও থেমে নেই। ঘাস হয়, আবার মরে যায়। আমি শুধু নিরালায় নিজের মুখোমুখি হলেই থেমে যাই। লোকে কি সুন্দর মরে যাচ্ছে। বেঁচে উঠছে। ঝগড়াঝাটি করে। মানে না বুঝে যেখানে-সেখানে ঢুকে পড়তে পারে।

'বাড়ি চলো।'

'তুমি কাল রাতে জেগে ছিলে?'

'বাড়ি চলো।'

'আমি নীচে নেমে যাচ্ছিলাম—ডাকলে না কেন?'

'প্রায়ই তো যাও। কোন্‌দিন তুমি এক মটকায় শুয়ে থেকে রাত কাবার করলে।'

এ কি! দেবী কতদূর জানে—!

'যাবে তো চলো।'

'আমায় ডাকলে না কেন কাল রাতে?'

'রোজ তুমি জেগে উঠে সিগারেট ধরাও। পায়চারি করো। বাগানের আলোর সুইচ টিপে কোনো-কোনোদিন বাগানেও নেমে যাও—' বলতে বলতে দেবী বাড়ির পথ নিল। আমি এসেছিলাম ওকে গুণ করতে। আমি ওর কথার টানে, চলার টানে পেছন পেছন চললাম।

ও তখনো বলছিল, 'বাগানে নেমে কতদিন তুমি নিশুতি রাতে হেলেপড়া গাছপালাকে সোজা করে তুলে দিয়েছ। আমি তখন দোতলার ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে।'

'কাল কিন্তু বাগানের আলো আমি জ্বালিনি দেবী।'

'কখনো আর ওরকম করো না। অন্ধকারে কি থাকতে পারে বলা তো যায় না।' দেবী বলছিল আর হাসছিল।

॥ সাত ॥

ভরা দুপুরে পক্সের ভ্যাকসিন নিয়ে ফিরে এল সুকুমার। ঘরে বসেই দেখলাম, একজন ক্লান্ত যুবক হলুদ বর্ণের চোখ নিয়ে আমাদের বাড়ির জানলায় কাকে খুঁজছে। আমি আর একতলায় নেমে আসিনি। বোধহয় মালতীই দরজা খুলে দিল। নিশ্চয় ওর হাত থেকে ভ্যাকসিনের ফাইলটা নিয়ে আগেই বলেছে, 'চা করে দেবো!' সুকুমার ভীষণ চা খায়। আহা! মালতীর এখন একটা মাত্র বর। পিছনে সব সময় দু'টি স্মৃতি ঝুলে আছে। আমার সুবিধা আমি সব ভুলে যাই।

রঘু পাকড়াও করেছে আমাকে অনেকদিন পরে। নানান প্রশ্ন। ও সবচেয়ে বেশি জানতে চায় আমার মায়ের গল্প। আমার দেখাদেখি ও রোজ ঘুম থেকে ওঠার সময় মায়ের ছবিখানায় নমস্কার ঠোকে—তারপর কলতলায় ছোটে।

আশ্চর্য কাণ্ড। এই ছেলেটি আমারই। অথচ ওর জন্যে আমি তো বিশেষভাবে কিছুই ভাবি না। লোকে ভাবে। আমিও একজন লোক। আমার জীবনের এখন সেই সময় যাচ্ছে—যখন লোকেদের দাড়ি সবচেয়ে কড়া থাকে। একেবারে হার্ডব্রাশ। এরপরেই নাকি দাড়ি আস্তে আস্তে কিশোর বয়সের মতো মোলায়েম হয়ে যাবে। আমি নাকি ক্রমেই একটু একটু করে সাইজে ছোট হতে থাকবো। ভেতরের হাড় ভাঙলে তখন মুট করে একেবারে দু' টুকরো হয়ে যাবে।

হঠাৎ রঘু আমাকে ছেড়ে দিয়ে দুপদাপ করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল। ওর মা যে এই বাড়িটায় কোথায় কখন থাকে! তাই বলো: রঘু কোয়ার্টারের মাঠ দিয়ে ছুঠছে। গরুর দড়ি পার হলো চোখ বুজে। আমরাও তাই করতাম। গেটে গিয়ে দৈতরিকে জড়িয়ে ধরলো।

দৈতরি আরও ভেঙেচুরে গেছে। আমি তখন আর নীচে গেলাম না। লোকের দুঃখকষ্ট, অপমান আমার ভালো লাগে না। যার-যার নিজের ব্যাপার নিয়ে নিজেরা থাকো। খাও-দাও ঘুমোও। প্রাণ চায় তো পেটভরে কান্নাকাটি করো। বারণ করব না। কিন্তু আমাকে ঘাঁটাতে এসো না। লাভ হবে না কোনো।

আমি বুঁদ হয়ে আছি। মানে না বুঝেই বুঁদ হয়ে যাচ্ছি। কি হচ্ছে চারদিকে। কি সব হয়ে গেল ক' বছরে। আমি কিছুতেই যোগ দিতে পারিনি। সবাই যখন হাসে—আমিও তখন হাসি। সবাই যখন গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করে—আমি তাদের সঙ্গে উঠে দাঁড়াই, মাথা নীচু করে থাকি, শোক পালন করি। অথচ কেউ আমাকে তাদের সঙ্গে নিল না।

আমার কিন্তু কোনো দোষ নেই। আমার দোষ—আমার খুঁত নেই কোনো। আমিও অন্যদের মতোই ব্রিফ-কেস হাতে নিয়ে ঘুরি তাতে বাইরের দিকে আমার নামের কার্ড থাকে। মার্জিতরুচি লব্ধপ্রতিষ্ঠ, যশস্বী হবার জন্যে লোকে যা যা করে, প্রায় দশ-বারো বছর তাই তাই করে আমি দেখেছি। বোধহয় এতদিনে ওইসব হয়েও গেছি। দোষের মধ্যে মাঝে মাঝে বেশি রাতে স্টেশন-ফেরত জগদীশ রায় বাকিতে রিকশায় উঠেছে। কেননা, অনেক সময় আমার কাছে খুচরো থাকে না। তাই আমি বাকিতে চড়ি। পরদিন ভোরে আর দেওয়া হয় না। তাই প্রায় আট ন'জন রিকশাওয়ালা আমার কাছে পয়সা পায়।

আরও মুশকিল হয়েছে, ইদানীং কোনো ব্যাপারেই আর চাড় নেই আমার। একটু-আধটু পা পেছলাতে বরং ভালো লাগে। কতদিন স্বপ্নে খাট থেকে পড়ে গেছি। আসলে পড়িনি। ঘুম ভেঙে দেখি ডান পা বেঁকে যাচ্ছে। শিরায় টান ধরেছে।

সময়ে অপকর্ম দু' চারটে করতে খুব ভালো লাগে। রঘু যখন আরো ছোট ছিল—তখন ওকে একা পেলে নিষ্পাপ কয়েকটা গালাগালি শিখিয়ে খুব আমোদ হয়েছিল। দেবী রেগে গিয়ে বারণ করতে থাকলেই বরং ওর কান টানতে আরও বেশি মজা পেয়েছি।

লোকে নেতা দেখে মুগ্ধ হয়। হর্ষধ্বনি করে। ভিড়ের চাপে মূর্ছা যায়। আমার এসব হয়নি কোনদিন। কতলোক আগে-ভাগেই খুন হয়ে থাকে। আমি নিজে এবার খুন করব। একজনকে করেছি একজনকে আজও পারিনি।

বিকেলের রোদ আমাদের ছাদে এমন করে ছায়া ফেলে—স্পষ্ট বোঝা যায় বয়স শুকিয়ে যাচ্ছে। মন তখন ঢলে পড়ে। চেনা রাস্তাগুলো, গাছের সারি, আরপুলি লেনে বিভুর কাকা, কত কি এক এক সময় বড় আপন হয়ে ওঠে। আবার ভাবি, যায় যদি যাক না হারিয়ে।

'কি চাই দৈতরি?'

একটা কুঁজো লোক ঘরের ভেতরে চলে এল। চুপচাপ।

'পেলি? কোথায় ছিল?'

'সেই লঞ্চঘাটায়। আরেকটু দেরি হলে আর দেখা হতো না। ময়ুর সাঁকো দিয়ে লঞ্চে উঠছিল। আজুবাঈ মাটিতে বসে। পুঁটলিতে দুটো বেগুন—একখানা হাতা—'

আমি চুপ করেই আছি। ও আগে বলে যাক।

'বজরা বোঝাই দিয়ে ঝিনুক যাচ্ছে মেদিনীপুরে—তাদের চটির পাশেই আজু বসে। গিয়েই খপ্ করে হাত ধরলাম। কিছু বলতে পারিনি বাবু।'

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'সারারাত ঘুমোয়নি। নতুন করে সিঁদুর পরেছে মনে হলো—'

'তার মানে?'

'বাঁদরটা ফিরে বিয়ে করতে পারে হয়তো—গুণের তো ঘাট নেই। তোর মনে যদি এই ছিল ময়ুর, তবে বারো-তের বছরের আজু যখন এয়েছিল—তখন করিসনি কেন?'

দেখলাম দৈতরি কাঁপছে। ও যা বললো, তা হলো, সঙ্গে সঙ্গে আজুকে ধরতেই ময়ুর ছুটে এসেছিল। শেষে আজুর হাত ধরে টানাটানি লঞ্চঘাটায়। লোক জমে যায়। আজুর চোখে জল। ময়ুর ঘাবড়ে গিয়ে সরে পড়েছে।

'আজু কোথায়?'

'ওর বাপের বাড়ি দিয়ে এলাম।'

'নিয়ে আয়। ঘরে নিয়ে তোল।'

'না বাবু। ও জিনিস আর ঘরে নেব না।'

'বোকা! ঘরে নিয়ে যা। বাড়ি নিয়ে গিয়ে আঙুলগুলো শিলনোড়ায় ছেঁচে দে ভালো করে।'

আমার মুখে হাসি। দৈতরি আমার মুখ দেখে ঠিক বুঝতে পারছিল না। শেষে বললো, 'আঙুলগুলো বড় সুন্দর বাবু। মর্তমান কলার মতো। প্রাণে ধরে তা আমি পারব না।'

'কেন রে! ভালো করে ছেঁচে দে। সারা জীবন মনে থাকবে।'

'না বাবু। ও বউ আমি ঘরে নেব না।' তারপর থেমে বললো, 'প্রাণ-সংশয় করে দেবে বাবু।'

আমি তাকিয়ে আছি দেখে বললো, 'খোকা-খুকু সুদ্ধ্ কোনদিন আমায় সাবাড় করে রেখে দেবে বাবু। ও মেয়েমান্‌সির কিছু ঠিক নেই।'

'তার মানে?'

'ভাতের সঙ্গে ফলিডল দিয়ে দিতে পারে বাবু। আজু বড় গোঁজধরা মেয়েমানুষ। একবার যা মাথায় ঢুকেছে ও নামানো বড় শক্ত—'

বুঝতে পারলাম না, আজুর জেদের কথা বলে দৈতরি গর্ব করছে না দুঃখ করছে!

'তোর কষ্ট হয় না আজুর জন্মে?'

দৈতরি মাথা নীচু করলো। পিঠের হাড় উঁচু হয়ে ওঠায় খুব কুঁজো লাগলো, 'ভাবলে বুকের ভেতর ব্যথা করে বাবু। এইসব হাড়-পাঁজর ফুঁড়ে যন্তন্না বেইরে আসতে চায় বাবু। পুরুষলোক। কাঁদলে বদনাম হবে তাই কাঁদতে পারিনি।' দৈতরি আমার কাছে অনেকদিন আছে। ইদানীং আমার গালে অনেক মাংস। ভারভারিক্কি ভাব এসেছে আমার পিঠে। দৈতরিও বুড়ো হয়ে যাচ্ছে খেয়াল করিনি। বললাম, 'তুই তুক করলে পারিস আজকে—'

'তুক হয়ে আছে আজু। ময়ূর তুক করেছে। না হলে আমার এতদিনের বউ এমন ব্যাভার করতে পারে না কিছুতেই।'

শীত চলে যাবে বলে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। মাঘের শেষ হয়ে যাচ্ছে। মেঘ করে বৃষ্টি হয়েছিল ক'দিন আগে। ছাদের শ্যাওলা বিকেলের রোদ পড়ে মখমল হয়ে আছে একেবারে।

দৈতরি বললো, 'লঞ্চঘাটায় আজুকে নতুন কাপড় পরনে দেখেই আমার মাথার ভেতর খচ্ করে উঠলো। তারপর আঁচলের কাছে

দেখি—যা ভেবেছি, তাই। একটা লম্বা চুল গাঁথা রয়েছে। এ নির্ঘাত আমাদের ময়ূরের কাণ্ড। আজুর ওপর যে কতদিনের নজর তাই এখন ভাবি।'

'একেবারে গুণ করে ফেলেছিল বল। ভালো ভাই তোর!'

'কপাল বাবু!'

এখন আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল একটা জিনিস। যত স্মৃতিই থাক, যত বাধা-বাঁধনই থাকুক না কেন—কারও বশ হয়ে গেলে সে সব আর কোনো ব্যাপারই না। সব তুচ্ছ হয়ে যায় তখন। আগাম বাতাস পাঠিয়ে ঝড় কেমন বড় বড় গাছের ডালপালা টানাটানি করে।

'তাই বলে বাপের বাড়ি রেখে এলি আজুকে! সেখানে যদি কিছু করে বসে থাকে?'

'করলে করবে। আমার আর কিছু করার নেই।'

আজ ক'দিন হলো দৈতরি ছিল না। হরতুকীতলায় গুচ্ছের শুকনো পাতা জমেছে। কুয়ো পাড়ে কেউ বোধহয় যায়নি ক'দিন। মাকড়শা দিব্যি জাল বুনে ফেলেছে। তখনো দৈতরি মাথা নীচু করে বসে। ম্যাসের সঙ্গে জল ছিটিয়ে নিয়ে খাবারদাবার মাখোমাখো করে একটা কাগজে ঢেলেছে মালতী। এক হাতে তাই, অন্য হাতে অ্যান্টিজার্মের শিশি—জলে ঢেলে দেবে।

সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে এল মালতী। পিছনে সুকুমার। এসব কাজ সুকুমারের করার কথা। অথচ করছে মালতী। সুকুমার ইদানীং গোপনে চাকরি খোঁজে। কেন খোঁজে বুঝি না। চাকরি নেই বাজারে। সবাই চাকরি চায়। মাস গেলেই নিশ্চিন্তে মাইনে।

আমি সুকুমারকে দু'বার বলেছি। বলতে চেয়েছি: বড় কিছু ভাবো। বড় কিছু কল্পনা করো। যত ছোট হয়েই তা ফলুক না কেন—তোমার চাকরির চেয়ে সবসময় তা বড় হবে। তাতে তুমি সুখ পাবে।

এখনকার ছেলেমেয়েদের ঠিক বুঝি না। আমার এসব কথায় সুকুমাব অবিশ্বাসের হাসি তুলে তাকিয়ে থেকেছে। যেন আমি কোনো রূপকথা বলছি।

ওরা দু'জন কিন্তু এখন রূপকথারই ছবি হয়ে মুরগীদের জালের বাইরে দাঁড়ানো। তিনশো বার্ড একসঙ্গে মালতীকে দেখে ছুটে এল। জালের ওপারে তাদের কি লাফালাফি!

আমি দেখছিলাম, মালতী কি সুন্দরভাবে ওদের খাবার সাজিয়ে দিল। শেষে ওষুধ দিল। একটা মুরগী প্রায় হাতে উঠে এসেছিল। 'নাব নাব' বলে নামিয়ে দিল। আমাদের সুকুমার তখন সবে একটা সিগারেট ধরিয়েছে।

মালতী জালের দরজা আটকে চাবি দিচ্ছিল। পেছন থেকে সুকুমার ওর ঘাড়ে চিবুক রাখলো। মানুষের একটা আস্ত মাথা, চোখ হলুদবর্ণ, সিঁথির দু'পাশে দু'থাক চুল ঢলে পড়েছে। আশু যেন এরকম একটা মুণ্ডুই আমাকে আনতে বলেছিল।

কলেজে আমি পপুলার। আনপপুলার সবচেয়ে বিভূতিবাবু। পণ্ডিত লোক। কিছু খিটখিটে। অলঙ্কার পড়ান। গভর্নিং বডি সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু আমি জানি মানুষটি ভালো। আমার সঙ্গেও ভদ্রলোক প্রায়ই বাঁধিয়ে বসেন। আমি হেরে গিয়ে মেনে নিয়ে থাকি।

থার্ড পিরিয়ডে আমি একাই ছিলাম ঘরে। প্রফেসর্‌স্ রুমে একখানা পুরনো কাগজের নীচে শঙ্খবস্ত্রখানা মেলে দিয়ে বিভূতিবাবুর চেয়ারে পেতে রাখলাম। ভদ্রলোক ভ্রূ কুঁচকে ঘরে ঢুকেই চেয়ারে বসলেন। আমি চুপচাপ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। খানিক পরে নিজেই বললেন, 'চা খাবেন জগদীশবাবু?'

বুঝলাম ওষুধে ধরেছে। বললাম, 'বিলক্ষণ। এমন মেঘলা দিনে—'

'আমার চেয়ারে কাগজ পেতে রাখল কে বলুন তো?' ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

'বসুন না। একখানা কাগজে আর কি হবে?'

কাগজখানা টেনে ফেলতেই আমার শঙ্খবস্ত্রখানা বেরিয়ে পড়লো।

'এসব ন্যাকড়া-ফ্যাকড়া এখানে কেন? কে রাখলে? —বদ্যিনাথ!'

বদ্যিনাথ বেয়ারা চা আনতে গিয়ে থাকবে। আমি ছুটে গিয়ে বস্তরখানা তুলে নিলাম।

'ওখানা দিয়ে কি করবেন জগদীশবাবু? ব্যাগে ন্যাকড়া রাখছেন কেন?'

ভাবলাম, লোকটাকে সত্যি কথা বলি। একে একে সব বললাম। চায়ে চুমুক দিতে দিতে বিভূতিবাবু অট্টহাসিতে ভেঙে পড়লেন, 'আমাকে বশ করবেন ভেবেছিলেন! যত্ত সব গাঁজাখুরি!' তারপর মোলায়েম হয়ে বললেন, 'আমি আজ থেকে আপনার বশ হয়ে গেলাম।'

ভদ্রলোকের ভেতরে জলভরা এতবড় একটা ডাব ছিল জানতাম না।

কলেজ থেকে বেরোচ্ছি। কাল রাতে সায়ান্স ল্যাবরেটরির দক্ষিণের দেওয়ালগুলো জুড়ে আলকাতরায় শ্লোগান লেখা হয়েছে নতুন।—'জনগণের পাশে দাঁড়ান। জনগণের পাশে দাঁড়ান। জনসাধারণই ইতিহাসের নিয়ামক।'

বেলা তিনটে না বাজতেই সেদিন আমরা সবাই বেরিয়ে পড়লাম। রঘু আগে আগে। তার পেছনে দৈতরি আর মালতী। ওদের হাতের রান্নাকরা খাবারে বোঝাই টিফিন ক্যারিয়ার। সুকুমার নিয়েছে সতরঞ্চি। আমি জলের ফ্লাস্ক আর ক্যামেরা। শুধু দেবীর হাত খালি।

আমরা ফুল্লশ্রী ধরেই এগোচ্ছি। আগেই ঠিক ছিল বেরোবো।

দিন মনে ছিল না। সম্বলপুরে এক কাঠের ব্যবসায়ীর ছেলে আমার ছাত্র। তাদের একটা বাড়ি আছে জানতাম। ছেলেটির উৎসাহেই আজ আমরা সেখানে যাচ্ছি। পূর্ণিমায় নাকি ওদের বাগানে জ্যোৎস্নায় স্বর্গ নেমে আসে। এসব বলে ছাত্রটি আমায় বলেছিল, 'সে না দেখলে আপনি বিশ্বাস করবেন না। থাকার কোনো অসুবিধে নেই। বাবা জেনারেটর রেখেছেন। বোতাম টিপলেই আলো।'

আলো ফুরোবার আগে গিয়েই আমরা পৌঁছলাম। মালী ছিল, ঠাকুর হাজির। ছাত্রটি ইংরেজিতে বড় কাঁচা। আমাদের জন্যে ব্যবস্থা কিন্তু সব পাকা করেই রেখেছিল।

ওরা ভেতরে চলে গেল। গেটে শ্বেত পাথরে লেখা বাড়ির নাম দেখে থমকে দাঁড়ালাম। 'অরণ্য মন্দির।' মহীতোষের বাবা নিশ্চয় জঙ্গল-প্রেমিক। ওরা খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল। আমি তাড়াতাড়ি হাঁটতে গেলাম ওদের ধরবো বলে। পারা গেল না। মোরম বিছানো পথ। জোরে এগোতে গেলেই গোড়ালি পিছিয়ে পড়ে।

খানিকক্ষণের ভেতর দৈতরি মালীর ঘরে গিয়ে ঢুকলো। সেখানে আমাদের রান্নাখাবার গরম করে নেবে।

রঘু ছুটে ছুটে এক-একটা বারান্দায় যাচ্ছিল আর সুইচ টিপে টিপে সবগুলো আলো জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। কোথায় কল-ঘরে ঘুট ঘুট করে মেসিন চলছে—কোন্ গাছতলার আড়ালে বোঝার উপায় নেই। এমন সব গাছ, এমন সব পাতা—বাংলা দেশে চোখেই পড়ে না। বোঝা যায় সম্বলপুরের ওদিককার। মন্দির না বলে অরণ্যদেশ বলা যায় বাড়িটাকে। এখানে বাঘ সিংহ না থাক, কিছু ভালো ভালো সাপ লুকিয়ে থাকার মতো গর্ত, আড়াল, ছায়া পেয়েছে নিশ্চয়।

ঘাট-বাঁধানো বিরাট দীঘি। দোতলার বারান্দার আলো চাঁদ উঠলেই মিইয়ে গেল। ফাল্গুন আসতে বেশি বাকি নেই। শিশির-মাখা ফুলগুলো সুবাস ছড়াচ্ছে। রঘুকে নিয়ে মালতী কড়াইশুঁটি ছাড়াতে বসে গেল। দৈতরি হালকার ওপরে একটা সবজি বানাবে।

নতুন জায়গা। সারাদিন কাগজ পড়া হয়নি। আমি বয়সোচিত পোজে ম্যাগাজিনের পাতা নিয়ে বসলাম। কি সব বাংলা। সেণ্টেন্স কন্স্ট্রাকসনের ধরন দেখলে গা জ্বলে। অথচ এই কিনতে কাড়াকাড়ি। গ্রিলের ভিতর দিয়ে দেখলাম, দেবীর পেছন পেছন স্থকুমার গিয়ে ঘাটলায় বসলো। আমি জানি দেবী এখন ওকে আদর্শ স্বামী বিষয়ে বোঝাচ্ছে এবং উদাহরণ হিসেবে আভাসে ইঙ্গিতে আমারই কথা বলছে।

রঘু যতটা না শুঁটি ছাড়াচ্ছিল, তার চেয়ে বেশি কাঁচা কাঁচাই খেয়ে নিচ্ছিল।

মালতী একটা চড় কষিয়ে দিতেই দুপদাপ করে নীচে নেমে গেল। কাঁদতে কাঁদতে একেবারে দৈত্তরির কাছে।

ঘাটলা থেকে স্থকুমারের কিছু কিছু গলা পাচ্ছি: বুঝলেন মামীমা, সংসারে সবকিছু মানিয়ে নিতে হলে—'

এইসব গাছপালার ভেতরে স্থকুমারের কথাবার্তা স্রেফ মুদির দোকানের ঠোঙার মতো শোনাচ্ছে।

দেবী যাকে বলে স্থললিত কণ্ঠে নানান উপদেশ দিচ্ছিল।

এতবড় বাড়ি। পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি। ঘরে ঘরে পালঙ্কে মোটা জাজিমের পুরু বিছানা। কাছেই মালতী একটা ঝকমকে স্টেনলেস স্টিলের সবুজ বাসনে কড়াইগুলো খুলে খুলে রাখছিল। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

'তোমার এখন খুব স্থবিধে হলো। কি বলো জগদীশদা!'

আমি তাকাতেও ভয় পাচ্ছিলাম।

'বেছে বেছে স্থন্দর একখানা বাড়ি বের করেছ বেড়াবার। বেশ বাগান আছে। ফাঁকা আছে—'

'তোর ভালো লাগছে না মালতী?'

'খুব। কিন্তু তাই বলে আজ রাতে কিন্তু এসো না। ও জানলে মরে যাবে—'

'তোকে বুঝি ভালোবাসে খুব?'

মালতী মাথা নামালো। আমি চুপ করে রইলাম। তারপর বললাম, 'আমাকে বিয়ে কর না মালতী! তোর স্কুমারের চেয়ে অনেক আদরে রাখবো।'

'তা আর হয় না। ও তাহলে মরে যাবে।'

'কি করে বুঝলি। তিন-চার মাসে তোকে তো একখানা শাড়িও দেয়নি।'

'আমার কি অভাব আছে! মামীমা কত দিচ্ছে।'

'সুকুমার তোকে গুণ করেছে, বুঝলি। নইলে—'

'তুমি আমায় গুণ করতে—এইতো!'

আমি সরে যাচ্ছিলাম। সে সুযোগ মালতী আমাকে দিল না। চোখে, মুখে সব জায়গায় ভেজা ঠোঁটজোড়া ঠেসে ঠেসে একটি করে চাঁপা ফোটালো।

'আজ মুরগীগুলো কে দেখবে মালতী!'

'সারা রাতের খাবার দিয়ে এসেছি। এখন অন্য কথা বলো জগদীশদা!'

কি মেয়ে রে বাবা। এক এক সময় হাতজোড় করে রেহাই চায়। আমি তখন ভাবি, হাজার হোক আমি পনেরো-ষোল বছরের বড়। ওর কল্পনায় যেমন পুরুষ লোকের ছবি আছে তার সঙ্গে আমার বোধহয় অনেক ফারাক। আসলে তো আমি অন্য সময়ের লোক। ওর চেয়ে বেশ পুরনো। তখন ভাবি, কি হবে এসব করে! আমার যে অনেক কিছু করার মতো জোর শরীরে পড়ে থাকে। ব্যবহার হয় না। এই লেকচার দিয়ে, খাতা দেখে, গরু-বাছুর মুরগীদের ক্রিমির ওষুধ খাইয়েও অনেক কিছু করার মতো ইচ্ছে, তেজ আমার শরীরের ভেতর জমে থাকে। অথচ সে সব ইচ্ছে খাটানো হয় না। কোনো কাজে লাগানো হয় না। দেবী শুধুই দয়া।

মালতী উঠেছিল কড়াইশুঁটির খোসাগুলো ফেলতে। লম্বা বারান্দা দিয়ে খানিক গিয়ে রেলিংয়ে ঝুঁকে পড়ে ও নীচে ফেলে

দিল। ঘুরে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি ওকে পা থেকে মাথা অবধি আমার সঙ্গে মিশিয়ে নিলাম, জোর করে।

'ছাড়ো। ছাড়ো বলছি। থালাখানা পড়ে যাবে—'

'তোমাকে পাবার আমি আর কোনো রাস্তা জানি না মালতী।'

থালাখানা ও খুব সাবধানে একটা সোফায় রাখলো। আমার আর কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না। আমার বুকে হাত ঠেকিয়ে ও আটকে রাখতে চাইলো। আমি এসব সময় বুঝি না যে, লোকে কেন বাধা দেয়। দিয়ে কি হয়। তাছাড়া আমার ভেতর থেকে উঠে আসা এমন ইচ্ছে। ও তবু আমাকে সরিয়ে রাখতে চাইলো। বলতে চাইলাম, ভালবাসো না বাসো, এখন বাধা দিও না। সুকুমারের কত সুবিধে। সবটা মিলিয়ে ও খুব করুণ—তাই মালতী, দয়ার কথা নাই তুললাম—সবাই ওরই দিকে। আমি যা কিছু করি তাতে ওরা জোরের ছায়া দেখে।

আমাদের লড়াইটা হচ্ছিল নিঃশব্দে। সাক্ষী শুধু দেওয়ালের ছবিগুলো। দোতলা সমান উঠে আসা গাছের মাথাগুলো। আমরা দু'জনে গড়াতে গড়াতে তখন বড় ঘরের দরজায় আটকে আছি।

'মাপ করো। মাপ করো আমায় আজ। তোমার পায়ে পড়ি জগদীশদা—'

আমার মুখে কথা আসছিল না। কষ্ট হচ্ছিল। দুঃখ হচ্ছিল। কেন তা জানি না। সহজে কোনদিনই আমার কিছু হয় না। আমি তো জীবনে আগে এসেছি। তাই আমি অনেক জানি। মালতী বেশিক্ষণ পারলো না। বড় খাট ছিল। তাতে পুরু জাজিম ছিল।

আমরা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলাম।

মালতী পায়ের কাপড় অনেকটা তুলে বললো, 'দেখেছ? কেমন অলক্ষুণে মোটা হয়ে যাচ্ছি।'

'ভালো তো।'

'অ্যানিমিয়া। হাসপাতাল থেকে বেরোনোর পর একটু ওষুধ পড়েনি পেটে। পথ্যি হয়নি ঠিকমতো। রোজ রোজ মোটা হয়ে যাচ্ছি। তুমি আমায় একজন ডাক্তার দেখাতে পার না জগদীশদা?'

বাগানে জ্যোৎস্না। বারান্দায় ইলেকট্রিক। ঘরের দরজার বাইরে একচৌকো আলোর ওপর একজন কুঁজো মানুষের ছায়া স্থির হয়ে পড়েছিল। দৈতরি?

বললাম, 'সুকুমারকে বললে পারিস।'

'তাহলেই হয়েছে!' বলতে বলতে বেরিয়ে এসে মালতী দেখলো সুকুমার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে। আমিও দেখলাম।

সুকুমার তখন তখনই বেশ ভাবুক গলায় বললো, 'দৈতরি সেই থেকে শুঁটি চাইছে—'

আমার খুব অসুবিধা লাগছিল। ফট্ করে বলে বসলাম, 'মালতীকে ডাক্তার দেখাও না কেন?'

'কোত্থেকে দেখাবো মামাবাবু। আপনি তো সব জানেন—'

'ক' পয়সা লাগে! তবু এর মধ্যে কি করা যায় না—'

'আপনিই তো সব করছেন—'

মালতী তখনো তটস্থ হয়ে আকুলভাবে সুকুমারের দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি স্বার্থপরের মতোই সেখান থেকে সরে গেলাম। আমার বউ আছে। আমার ছেলে আছে। আমি খুব হিসেব করেই ওদের একা থাকতে দিলাম।

সিঁড়ি দিয়ে আমি নীচে নেমে এলাম। দেখাই যাক না বাগানটা ঘুরে।

শুনতে পেলাম, মালতী বলছে, 'তুমি কিছু খেয়ে নাও না। সেই কখন সকালে খেয়ে বেরিয়েছ—'

'না। আমরা এখান থেকে কবে যাব বলতে পার?'

আর শুনতে পেলাম না। হা ভগবান! আমি শেষকালে কী

হয়ে গেলাম! ওরা কি মনে করছে? বিশেষ করে সুকুমার? আমি কি কয়েদখানার চাবিওয়ালা হয়ে গেলাম? আমার কোমরে চাবির গোছা দুলছে। সবাই শুধু সেই আওয়াজটুকুই শুনতে পায়।

বাগানে এসে দেখি নানান ফুলে শিশির পড়ে চারদিকে বাস মাখানো ভিজে গন্ধ। একদিকে দেবী একা একা বসে। মালীদের ঘর থেকে রঘুর কাঁচা গলা ভেসে আসছে।

আমি আর দেবীর কাছে গেলাম না। একটা কাঠালিচাঁপা গাছ থেকে তীব্র মিষ্টি গন্ধ বেরোচ্ছিল। ওসব জায়গায় শুনেছি সাপ বাসা বাঁধে। আমি সেখানে গিয়েই গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসলাম। জ্যোৎস্না যেটুকু পেরেছে গাছপালার আড়াল দিয়ে নেমে এসেছে। জায়গাটা একেবারে মন-মাতানো আর অন্ধকার।

এসব জায়গায় আমি নিজেকে পরিষ্কার দেখতে পাই।

আমি দেখলাম, আমার একজন বউ থাকলেও আমি তাকে পুরোপুরি শান্তি দিতে পারিনি। আমি জানি না সে আমার কতটুকু জানে। কতদূর জেনে থাকতে পারে ভেবেই আমি আশঙ্কায় কাঁটা হয়ে আছি ইদানীং।

রঘু আমার ছেলে। তাকে আমি পুরোপুরি জানি না। সেও আমাকে জানে না। যেদিন আদর করে ফেলি সেদিন বেশি করে ফেলি। অনেকদিন আবার আদরই করা হয় না।

এখন বিশ্বাস হচ্ছে না। আমি কোথাকার লোক ছিলাম। এখন কোথায় এসে বসে আছি। বাইরে জ্যোৎস্নার বান ডেকে যাচ্ছে। সামনেই ঘর, বারান্দায় আলো জ্বালানো একটা প্রকাণ্ড বাড়ি। তার ঘরে ঘরে বিছানা, টিপয়, তাতে এলাচদানি অব্দি সাজানো। সম্বলপুরের জঙ্গলের বড় সম্বরের মাথা দেওয়ালে দেওয়ালে টানানো। আমি আজ এখানে। দীঘির পাড়ে আমার স্ত্রী বসে। দোতলার বারান্দায় সুকুমার, সুকুমারের স্ত্রী মালতী।

আমার কোনো স্মৃতি নেই। আমার কিছু মনে থাকে না। কোনো দাগ পড়ে না আমার মুখে। আমি তাই পরিষ্কার বেঁচে

আছি। মুখে এই নিষ্পাপ ছাপই কি আমার মুখোশ! অথচ মালতীকে সবসময় ডবল স্মৃতি পার হয়ে এগোতে হয়।

এখন তো দেবী স্বচ্ছন্দে গাইতে পারতো—আলোকের এই ঝর্নাধারায়....

চারদিক বেশ পবিত্র পবিত্র হয়ে যেতো।

'মামাবাবু!'

আমি চুপ করে রইলাম। জ্যোৎস্নার সঙ্গে সুকুমারের হলুদবর্ণ চোখ এখন মিশে আছে।

ধীরে ধীরে বাগান থেকে বেরিয়ে এলাম। গাছের আড়াল থেকে সরে এসে ওর সামনে দাঁড়াতেই সুকুমার চমকে উঠলো, তারপর সামলে নিয়ে বললো, 'কোথায় ছিলেন? চলুন মামীমার ওখানে গিয়ে বসি। মালতীর হাতের কাজ হয়ে এল বলে—এখুনি আসবে এখানে।'

ও আগে আগে—আমি পেছনে।

॥ আট ॥

দু'দিন পরের কথা। আমরা তিনজন ছাদে। আমি, মালতী, সুকুমার। সকালবেলা।

মালতী একটা একটা করে মুরগী ধরে দিচ্ছিল সুকুমারের হাতে। সুকুমার ওদের ডানা সাপটে ধরে আমার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। আমি পা ধরে খানিকটা রোঁয়া তুলে ফেলে সেখানে বসন্তের ভ্যাক্সিন ডলে দিচ্ছিলাম। সবে ওরা ডিম দিতে শুরু করেছে। এখনো সবার ঝুঁটি লাল হয়নি। পুরোপুরি লাল হলেই একসঙ্গে তিনশো দশটা বার্ড রোজ তিনশো দশটা করে ডিম দেবে।

আমি একমনে ওষুধ ডলে দিয়ে যাচ্ছিলাম। সুকুমার সেগুলো ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে যাবে পর পর। তেমনই কথা। হঠাৎ নীচে

কক্ আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখে তো আমার চক্ষুস্থির। সুকুমার সময়মতো ঘরে ঢোকায়নি সব ক'টাকে। কিংবা ঘরের দরজা ঠেসে চেপে রাখতে ভুলে গেছে। গোটা চারেক মুরগী দিব্যি ছাদ থেকে ঝাঁপ খেয়ে নীচে পড়েছে। একটা একেবারে পিচ-রাস্তায় গিয়ে পড়তেই রাস্তার কুকুর খ্যাঁক করে মুখে ধরেই দৌড়চ্ছে। অন্তত পনেরোটা টাকা বেরিয়ে গেল। প্লাস এই পাঁচ-ছ' মাসের খাটুনি আর কষ্ট, দু' বছর ধরে একটা করে ডিম—সব চলে গেল কুকুরের পেটে।

আমি রেগে গিয়ে সোজাসুজি সুকুমারের দিকে তাকালাম, সুকুমার চোখ নামালো। মালতী মুরগী-ঘরের ভেতর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসে সুকুমারকে আড়াল করে দাঁড়ালো। তাতে আমার পিত্তি আরও জ্বলে উঠলো, 'আনাড়ি। এক নম্বরের আনাড়ি। একটুও মায়া-দয়া নেই তোমার। হবেই বা কোত্থেকে। যেখান থেকে পারি আমি টাকা যোগাব!'

ইচ্ছে হচ্ছিল একটা চড় কষিয়ে দিই।

সুকুমার বললো, 'এরকমভাবে আমি কাজ করতে পারবো না।'

মালতী একবার ওর দিকে তাকালো। একবার আমার দিকে। ও বুঝতে পারছে, আমি কেন চটেছি। ও চাইছে, সুকুমার সব অবস্থা বুঝে সামলে চলুক।

আমি রেগে নীচে চলে এলাম। কলেজ যাওয়ার মুখে দেখলাম, সুকুমার বাকি মুরগীগুলোকে ধরে ধরে মালতীর কাছে এগিয়ে দিচ্ছে—আর মালতী পাকা হাতে ভ্যাক্‌সিন দিচ্ছে। খাঁটি ভেটারেনারি ডাক্তারের মতো।

কলেজে বিভূতিবাবুর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপের সময় বড় একটা সুন্দর কথা শুনলাম ওঁর মুখে। নিজেই বলছিলেন, 'আমার যা চরিত্র মশাই, আমি তাই-ই। নাইদার আই ক্যান্ বরো ইট—নর আই ক্যান্ লেণ্ড ইট।' শেষে হাসতে হাসতে ফিরে বললেন, 'আমার এই চরিত্র নিয়ে কে সামলাবে বলুন!'

তা সত্যি। বছর পনেরো হয়ে গেল; স্টেশনের ধারে মেসে থাকেন সিঙ্গল সিটেড্ রুমে। বারান্দায় টবে ফুলগাছ আছে। তাতে জল দেন নিয়মিত। মাইকেল গ্রন্থাবলী সব সময় মাথার কাছে থাকে বিছানায়।

কলেজ থেকে ফেরার পথে আমারও মনে হলো, আমি কি আমার চরিত্র অন্য কাউকে ধার দিতে পারি? আমি কি আমার চরিত্র অন্য কারও কাছ থেকে ধার নিতে পারি? অসম্ভব। তাহলে আমি কি আরেক বিভূতিবাবু হয়ে গেলাম। হবেও বা!

কোয়ার্টারে ফিরে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছি। বাড়ির সবাই তটস্থ। দেবী উদাসীন। রঘু দৈতরির মতোই নিজেকে নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। আসলে আমিই একা। আমিই একা। ছাদে মুরগীদেরও বন্ধু আছে। ওরা ঝগড়া করে ঠিকই। বিকারিং বার্ডস্ থাকবেই। পারিবারিক পোলট্রি বইতে স্পষ্টই লেখা আছে, ওদের মধ্যে নিজেদের মাংস ঠুকরে খাওয়ার রোগ দেখা দেয় মাঝে মাঝে। তখন কাঁচি দিয়ে ঠোঁট পাশ থেকে খানিক খানিক ছেঁটে দিতে হয়।

'বাবু' সুকুমারদা তিরিশটা টাকা চাইছিল, দেবো?'

'সুকুমার? কি ব্যাপার?'

'কলেজে ভর্তি হবে। আপনাকে জানাতে বারণ করেছে।'

আশ্চর্য। আমিই তো কলেজে ভর্তি করে দিতে পারতাম। দৈতরিকে বললাম, 'আমাকে না বলে কাউকে টাকা দিসনি।' ঘরে ঘরে ঘুরলাম। দেবী ঘুমোচ্ছে। খোলা চুলে একদিকে গাল ঢেকে ফেলেছে। নরম করে পা ভাঁজ করে গুটিয়ে আছে। রঘু ওপরে। বাঁ হাতের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম। মালতীর ঘরের দরজা হাট করে খোলা। জানলার গ্রিলে হাত রেখে খাটে বসে আছে।

আমি গিয়ে ওর পাশে বসলাম। একটুও চমকালো না। ওর কোমরে হাত রেখে বললাম, 'সুকুমার কোথায়?'

'শুয়েছিল তো। কখন উঠে গেছে—' তারপর একদমে বললো, 'ও আর থাকবে না বোধহয়—'

আমি মালতীর কাঁধে আমার চিবুক ঠেসে ধরলাম। যত চেপে ধরি আরাম লাগে। তারপর দেখলাম, সে আরামও পুরনো হয়ে যাচ্ছে।

'যদি যায় যাক না!'

মালতী খচ্ করে ফিরে তাকালো, 'তা কি করে হয়?'

'হবে না কেন? তুমি আমার কাছে থাকবে। এখানে না থাকো—অন্য জায়গায় থাকবে। আমি যাব সেখানে। আমি তোমাকে চাই।' কথাগুলি বলছি আর বুঝতে পারছি এসব কথা আমার বুকে বাসা বেঁধে ছিল, 'আমি জানি না মালতী—এই তুমি কেমন—পুরোপুরি জানতে চাই,' বলছি আর ওর মাথায় গালে আমার দু'খানা হাত ঘুরে এল।

মালতী হাসতে হাসতে বললো, 'তা হয় না জগদীশদা।' ও বোধহয় বুঝতে পেরেছে, ওকে আমার কোনো না কোনো রকমের সত্যিকারের ভালো লাগে।

আমি খুব ঘন করে চুমো খেলাম। কোনো বাধা দিল না। বরং যোগ দিল। শেষে বললো, 'আমার ওষুধের তো কোনো ব্যবস্থা করলে না। রোজ আমি ফুলে যাচ্ছি। অথচ শরীরে রক্ত নেই। কমে যাচ্ছে।'

একটা কিছু করা উচিত বুঝি। কিন্তু করা হয়নি। হঠাৎ মালতী বললো, 'তাহলে তুমি আমার কোন্‌টুকু চাও। অসুখ-বিসুখ বাদ দিয়ে?' প্রায় হো হো করে হেসে উঠে বললো, 'সুকুমারও তাই। আমার নাকি জ্বর, মাথাব্যথা, অম্বল এসব হতে নেই। আচ্ছা বলো তা আমিও তো মানুষ!'

দেখলাম আমি কোনো কথাই বলতে পারছি না। 'তুমি দুটো করে ডিম খেলে পার। এখন তো বাড়িতে হচ্ছে—'

'সুকুমারের বারণ। ডিম আমাদের নাকি জীবনে দাঁড় করাবে! তুমি চেষ্টা করেও ওকে দাঁড় করাতে পারবে না জগদীশদা। ওর যে কি হয়েছে! শুধু জানতে চায়—আমি কোথাও কিছু করেছি কি না। আচ্ছা সেটাই বড় হয়ে গেল?'

'তুই ওর জন্যে মরিস কেন ?'

'তুমি আমার জন্যে ওরকম করো কেন বলো তো ? তাই আগে বলো ?'

কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু দেখলাম বার বার সাজিয়ে বলা যাচ্ছে না। থতমত খেয়ে বললাম, 'তোমরা—তুমি অন্য টাইমের লোক। তুমি পুরোপুরি, মানে, আগাগোড়া কেমন তাই আমি জানি না। তোমাকে পেতে কেমন—তুমি আমার হয়ে গেলে কেমন হয়ে যাও, কি করো তাই আমি জানতে চাই। আমি কি সুকুমারের চেয়ে খারাপ মালতী ? দেখ আমার সব আছে। তুমি যা চাও সব আছে আমার। আমি দিয়ে দিতে চাই সব তোমাকে—'

আমার গলায় বোধহয় প্রার্থনা ছিল। বোধহয় দখল নেবার জেদ ছিল। কিন্তু ওকে আমি কিছুতেই ছুঁতে পারলাম না। মালতী পরিষ্কার বললো, 'আমিও তো জানতে চাই সুকুমার কেমন ? আমি ওর কাছেই যেতে চাই জগদীশদা। ও কিন্তু একদম নিতে জানে না।' হঠাৎ বললো, 'নাও ওঠো। আমি এবারে চায়ের জল চাপাবো। মুরগীদের খাবার দেবো। আচ্ছা জগদীশদা, দৈতরি বাড়ি গেল না !'

'যাবে না।'

'দেখো তুমি, ও না গিয়ে পারবে না।'

'না। ও যাবে না।' বললাম বটে, কিন্তু দেখছি তো রোজ, দৈতরি আরও বেশি মন দিয়ে কাজ করে। গরুর জাব দেবার সময় ওর গলকম্বলের ঘণ্টায় নাড়া দিয়ে বাজনা শোনে। যেন ওর চেনা কোনো পুরনো গান। কান পেতে মিলিয়ে নেওয়া শুধু।

'ও টিকবে না দেখো তুমি।'

'কেন ?'

'তোমার এখানে সব আছে জগদীশদা। তুমি শরীরের স্বাস্থ্য মেনে চল সব সময়। কিন্তু মনের শরীর তুমি একদম মান না।'

'এসব ভাষা তুই কোথায় পেলি মালতী? কে শেখালো তোকে!'

'কেউ না। এসব আমাদের মেয়েদের শিখতে হয় না। তোমার এখানে ব্যবস্থা খুব পাকা। আদর আছে—ভালোবাসা আছে—সব আছে। কিন্তু আমাদের তুমি নিজের মতো চলতে দাওনি। দিচ্ছ না একদম। মামীমাকে দেখে বোঝ না! সোনার প্রতিমাখানা তুমি কেমন তামা বানিয়ে ফেলেছ।'

আমি বেশ ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম। এই দুনিয়ায় দু'টি জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার। জয়। দখল। তার নেশা আছে। বিপদ আছে। ভয় আছে। আমি তো এইভাবেই চলে আসছি। আমার কাছে শঙ্খবস্ত্র আছে। আমার মাদুলিতে সাপের মাথার মণি থাকে। শুধু খড়দহের শ্মশানেই যাওয়া বাকি। আমার অতীত আমি বিস্মৃতির দোকানে কবে বেচে ফুঁকে দিয়ে বসে আছি। আমার দলে কি তবে কেউ নেই। আমি খোলা দরজা মানলাম না। জানি, যে কোনো মুহূর্তে দেবী উঠে এসে আমাকে এ ঘরে মালতীর সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠভাবে বসে থাকতে দেখলে কি ভাবতে পারে। রঘুও তার অল্প বয়সের চোখে আমাকে এখানে এভাবে দেখলে চমকে যাবেই। দৈতরি হয়তো দেখলেও চুপ করে যাবে। আমি সুকুমারের কোনো পরোয়া করি না।

আমি সোজাসুজি মালতীর দিকে এগিয়ে গেলাম। হাতের মাদুলিটা খুলে ফেলে ওর বুকের সবচেয়ে দামী জায়গা, যেখানে হৃদয় থাকে—তার ওপর চেপে ধরলাম, 'আমার কি দোষ মালতী? আমার সব আছে তাই কি! আমাকে তুমি নাও। আমাকেই গুণ কর—'

'আঃ। লাগে—ছাড়ো বলছি—'

মালতী প্রায় ধাক্কা দিয়ে বাইরে চলে গেল। আমি মাদুলিটা ধরে দাঁড়িয়ে আছি। ফাঁকা ঘর। এই পৃথিবীতে আমি ধরে রাখার মতো কিছু পাচ্ছি না। আমার দোষ এই যে—আমার সব আছে।

আমার ভেতরে খানা-খন্দ থাকলে সেখানে মালতী বা দেবীর প্রেম ভালোবাসা গড়িয়ে গিয়ে থিতোতে পারতো। সেরকম কিছু নেই বলে, কিংবা আমি নিখুঁত বলেই সব-কিছু আমার ওপর দিয়ে বয়ে গিয়ে পিছলে অন্য জমিতে গিয়ে পড়ে।

ছাদে পেলাম সুকুমারকে। মাথায় সেই ঢলে পড়া দীঘির মৃণালের ধারায় চুলের থাক। পাতলা গোঁফ। হলদে চোখ। পা ভাঁজ করে সিগারেট ফুঁকছিল। আমাকে দেখে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো। আরও খারাপ লাগল তাই। আমি কি ওর ওপরঅলা? মালিক? তা নয়। তবে কেন এ-রকম?

'তোমার চোখের সামনে কুকুর মুরগী মুখে নিয়ে পালালো—'

'চোখের সামনে কোথায় মামাবাবু। দূরে পিচ-রাস্তায়—'

'সে তো তোমারই গাফিলতির জন্যে।'

'আমাদের বংশে কেউ মুরগী পোষেনি কখনো।'

রাগে আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল। কাজে অষ্টরম্ভা—এদিকে কথার পাক যায়নি। আমি কয়েক সেকেণ্ড আমার ভেতরে ছিলাম না! আমার ভারী হাতখানা ধাঁ করে ওর গালে গিয়ে চড় কষালো। ও যেন এজন্যেই তৈরী হয়ে ছিল। ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে সুকুমার একবার শুধু বললো, 'তবে রে—'

আমি অবাকও হচ্ছিলাম—আবার রাগে জ্বলে যাচ্ছিলাম।

আমার নাক রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু তার আগে ওর রিব বক্সের ঠিক ডান দিকে কষে একখানা ঝেড়ে দিলাম। বিকেলের রোদ্দুর কোণা কেটে ছাদে পড়েছে বোধহয়। মুরগীরা জানে না কি হচ্ছে। সুকুমার কোঁত দিয়ে কংক্রিটের ছাতে পড়ে গেল। আমি তুলে ধরতে যাব—ঠিক তখুনি ও আমার গলা চেপে ধরল। আমার আর আমাতে থাকার উপায় ছিল না। সুকুমারের মাথাটা শক্ত করে ধরে ছাদে ঠোকা দিতেই 'ও বাবা গো' বলে সুকুমার আমার গলা ছেড়ে দিল। আমি আরেকবার ঠোকা দিলাম। সুকুমারের কপাল ছেঁচে গিয়ে রক্ত ফুটে উঠলো। আরেকটা ঠোকা

দিতে যাচ্ছি—এমন সময় সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল মালতী, 'জগদীশদা কোথায় গেলে—' হাতে চায়ের পেয়ালা। এইসব সময় আমি ওর হাত চেপে ধরে রাখি। ও চোখে বকে হাত ছাড়িয়ে নেয়।

মালতী এই অবস্থায় আমাদের দেখতে পেয়ে জোরে কেঁদে উঠলো, 'মামীমা গো দেখবে এসো। ওকে মেরে ফেললো যে—'; মালতী আর দাঁড়ায়নি। হাতের পেয়ালা পড়ে গিয়ে এইমাত্র টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আমি ঘাবড়ে গিয়ে একটু আলগা দিয়েছিলাম। দেখলাম সুকুমার মড়ার মতো পড়ে আছে। ঠিক তখুনি আমার নাক বেয়ে আর খানিকটা রক্ত এসে ধুতিতে পড়লো। পড়ে অনেকটা জায়গা নিয়ে শুষে গিয়ে কালচে হয়ে গেল। আমার যে কতখানি রাগ ভেতরে ছিল জানতাম না। আমি সেই অবস্থায় পড়ে থাকা সুকুমারকে উঁচু করে ধরে ছাদের ওপরেই আলগা দিয়ে ছেড়ে দিলাম। আবার ছেড়ে দেবো বলে সুকুমারকে আরেকবার তুলে ধরেছি, দেবী ছুটে এসে ওকে আমার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মাথাসুদ্ধ কোলে নিল, 'সরে যাও। তুমি মানুষ!'

মালতী তখনো আমাদের কাছে এগোতে পারেনি। আঁচল দাঁতে কামড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাঁদছিল। আমি নীচে নেমে যাওয়ার আগে একবার ওর সামনাসামনি দাঁড়ালাম। তখনো নাকের রক্তে আমার পাঞ্জাবির বুকপকেট অবধি ভিজে উঠেছে।

শোয়ার ঘরে আয়নায় দাঁড়িয়ে সব বোঝা গেল। সুকুমার যেন মরণকামড় দিতেই আমার গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পাঞ্জাবির গলা বলতে আর কিছু নেই। সব ছিঁড়ে একাকার অবস্থা। ডান গালে ঠোঁটের নীচে রক্ত লেগে আছে। আমি আর আয়নায় তাকাতে পারছিলাম না। সে তাকানো যায় না এত বিশ্রী। রাগ চলে যাওয়ার পর এমন ছায়া ফেলে যায় বোধহয়।

পাশেই কলঘর। সেখান থেকে তিন-তিনবার মালতী ছাদে জল নিয়ে গেল। আমাকে দেখে থাকবে। চোখ ডলছিলাম।

ভিজে তোয়ালে এগিয়ে দিল মালতী।

আমি নিলাম। ও কাঁচের গ্লাসে জল ঢেলে তাতে কয়েক ফোঁটা ডেটল ফেলে দিল। তারপর তুলোয় ভিজিয়ে আমার গালের ওপর, ঘাড়ে সব জায়গায় বুলোতে লাগলো। আমি জোরে সরিয়ে দিতে গেলাম। পারা গেল না। ও খুব জোরে আমার বুকে মাথা রেখে আমাকে ছ' হাতে জড়িয়ে ধরলো। আমি আরও জোরে সরাতে গেলাম ওকে।

প্রায় আমার বুকের ওপর ওর ঠোঁট থেকে কথাগুলো বেরিয়ে এল, 'তুমি আমাকে ভালোবাসো, তাই না?'

হাসছে না কাঁদছে বোঝা যায় না। 'তোমার মামীমা এসে পড়বে।'

'আসুকগে।'

'সুকুমারের জন্যে জল চাইছে বোধহয়। যাও দিয়ে এসো।'

'এখন চাইবে না। এইমাত্র দিয়ে এসেছি।'

'ওর কপাল-টপালে লেগেছে। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের বাঁ দিকের তাকে পেনিসিলিন অয়েণ্টমেণ্ট আছে। দিয়ে এসো।'

'দরকার হবে না। দেখো এখুনি ঠিক চাঙ্গা হয়ে উঠবে!'

আমি অবাক হয়ে ওর কপালে ঠোঁট রাখলাম।

মালতী ঠিক সেই অবস্থাতেই আমার বুকে ঠোঁট চেপে ধরতে ধরতে বললো, 'আমি আর তুমি এখানে আছি। ও কি আর বেশিক্ষণ ছাদে থাকতে পারবে। তিন লাফে নীচে চলে এল বলে—,' এসব কথা বলেও এই অবস্থায় এমন খিল খিল করে হেসে ফেললো—তাতে আনন্দও আছে—খানিক অবুঝ হাসিও আছে।

'গরম জল নিন বাবু।'

দৈতরিকে দেখেও মালতী সরে গেল না। বরং সেই অবস্থাতেই আমার ঘাড়ে গলায় ডেটলের জলে ভেজানো তুলো বুলিয়ে দিতে লাগলো। আমার পা টলছিল। সুকুমারের হাতে নখ বড় বড়। নানা জায়গা ছড়ে গেছে। কোথাও চুলকোচ্ছিল—কোথাও জ্বলে যাচ্ছিল।

আমি এক ঝটকায় ওকে সরিয়ে দিলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় আমার দিকে অবাক হয়ে তাকালো। তারপর হেসে ফেললো।

আমি বুঝলাম মালতীর কাছে আমি ধরা পড়েছি।

রাতে রঘু ঘুমিয়ে পড়ার পর দেবী ছেলেকে টপকে অনেককাল পরে আমার কাছে এল। পিঠে হাত রাখলো। আমরা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি কতদিন দূরে রেল লাইনের ওপর মালগাড়ি শান্টিংয়ের আওয়াজ শুনতে পাই।

দেবীর হাতের চূড় এক সময় আমার পিঠে ফুটতে লাগলো। আমি বলে ফেললাম, 'একটা বয়সে আমার এত গর্ব ছিল—বলেছিলাম, যে লেখকের লেখা আমি পড়িনি—সে লেখকই নয়।'

'তোমার তো কোনদিন গর্ব ছিল না!'

'ছিল। আমি জানতাম। তোমার সামনে কোনদিন বাইরে বের করিনি।'

খানিক পরে দেবী আস্তে আস্তে বললো, 'এই বয়সে তোমার অত রাগ ভালো নয়। রাগারাগি ভালো নয়। শরীর খারাপ করে।'

মনও খারাপ করে। কিন্তু দেবীকে তা বলে লাভ নেই। আজ নিশ্চয় আমার কোনো দোষ ছিল না।—আমার বংশেও কেউ কোনদিন মুরগী পোষেনি!—এটা একটা হ্যাবিট। একটা প্রয়োজন। তার বেশি কিছু নয়। অথচ 'আধুনিক পোলট্রি ফার্মিং' বইখানায় কেমন লেখা ছিল ঃ যদি আপনি আপনার কাজ ও ছোট পাখিগুলিকে ভালোবেসে থাকেন, তাহলে এদের সেবা করে আপনি সত্যই আনন্দ পাবেন আর সফলকাম হবেন, যেমন অপরে হয়েছে। কিন্তু সবার আগে এগিয়ে যান আর চলার পথে এই ছোট বইটি....ইত্যাদি আরও যেন কি। আমার এরকম আরও অনেক কথা মনে আছে। যেমন ঃ কলম্বাস দ্য হিরো অব দি প্লে রাউণ্ড হুজ হোপস্ অ্যাণ্ড অ্যাসপিরেশন.... এখানে এসে আমার অ্যাসপিরিন, কোডোপাইরিন, অ্যানাসিনের কথা মনে পড়বেই। হাজার হোক নোট-মেকারের ইংরাজি।

দেবী আমার পিঠে হাত বোলাতে লাগলো। এক সময় হাত থেমে গেল। বুঝলাম, আমাকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে ও ঘুমিয়ে পড়লো। আমি আস্তে ওর হাত নামিয়ে দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠলাম। মুরগীরা এখন ঘুমোচ্ছে।

আন্দাজে ড্রয়ার থেকে সিগারেট নিলাম। বাইরে এসে ধরিয়েছি। দৈতরির ঘর অন্ধকার। হরীতকী তলায় ঘোরাঘুরি করলাম খানিকক্ষণ। ওরা স্বামী-স্ত্রী আশুর হাতে ধরা পড়েছে অনেকদিন। ছানাপোনা কি রেখে যায়নি একটাও ?

চারদিক কুয়াশা মাখানো দুধ-জ্যোৎস্নায় ঢেকে আছে। কলেজ বাড়িটা জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে। খুট করে দরজা খোলার আওয়াজ হলো। এত রাতে মালতী কি আর বুদ্ধি করে বেরিয়ে আসবে! আমার সময়টাই খারাপ।

বেরিয়ে এল সুকুমার। আমি গাছতলায় দাঁড়ানো বলে দেখতে পায়নি। কাঁধে ঝোলা।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়াতেই চমকে উঠলে সুকুমার।

'চলে যাচ্ছ ?'

সুকুমার অল্প একটু দাঁড়ালো।

'মালতী জানে ?'

'না।'

'তাহলে তোমার যাওয়া হলো না।'

'আমাকে যেতেই হবে মামাবাবু। আটকাবেন না।'

'তুমি চলে গেলে ও মরে যাবে সুকুমার।'

'আপনি আছেন তো!' অন্ধকারে ফিকে জ্যোৎস্নায় বোব গেল না, সুকুমার হাসছে না দাঁতে নীচের ঠোঁট কামে ধরেছে।

আমি কোনো খোঁচাই গায়ে মাখলাম না। সুকুমার যদি বে তো আমি এখনই নতজানু হয়ে ওর কাছে ভিক্ষা চাইতে পারি। কি

উপায় নেই কোনো। আমাদের মাঝখানে বয়স, সম্পর্ক, সম্ভ্রমের দেওয়াল উঁচু হয়ে দাঁড়ানো। আমি চাইলেও সেই দেওয়ালের বাধা এড়ানো যাবে না।

তবু বললাম, 'ভুল কোরো না সুকুমার। মালতী বড় দুঃখী। তোমাকে অনেক করে পেয়েছে। তাকে ঠেলে দিও না।'

অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল সুকুমার। আমি গিয়ে ওর পিঠে হাত রাখতেই এক ঝটকায় সরিয়ে দিল, 'আমি তো ঠেলে দিচ্ছি না। ওকে এসে নিয়ে যাব একদিন। তার একটা ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে। সেজন্যেই যাব।'

'আমার কাছে থাকো না। তুমি এখন কোথাও গেলে কাজ পাবে না। কত লোক ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে।'

'আমি থাকব না।'

'আমারই দোষ সুকুমার। আমি তোমাদের চিনি না। আমি তোমাদের বুঝি না।' আমরা কথা বলতে বলতে পিচ-রাস্তায় চলে এসেছি। 'আমি অগেকার লোক। তুমি পরেকার। তোমরা কেমন হও আমি পুরোপুরি জানি না। জানতে চাই—অথচ বোঝা যায় না।'

তবু সুকুমার দাঁড়ালো না।

'আমার দিকে তাকাও সুকুমার। আমি আর অল্প কয়েক বছর পরেই বুড়ো হয়ে যাব। তখন তুমি পুরোপুরি থাকবে। এই পোলট্রি বাড়বে। আরও অনেক বার্ড আসবে। তুমি আর মালতী ডিম ফোটাবার ব্যবস্থা করে মাংস বেচতে পারবে অনেক। এক্সপ্যাণ্ড করো—সব সুযোগ তোমার হাতে—'

'ওসব বিশ্বাসে আপনি তা দিন গে বসে বসে।' সুকুমার আর দাঁড়ালো না, 'সময় হলে আপনার মনোমতো ছানা বেরোবে—'

আমরা দু'জনই নিজেদের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। সুকুমার আমার দিকে মুখই তোলেনি প্রায়। হন হন করে বাঁক নিতেই ওর চেহারাটা কুয়াশায়, জ্যোৎস্নায় মিশে গেল। আমি একা

দাঁড়ানো। আমি মার্জিতরুচির প্রোঃ। আমি অনেকদূর বুঝি। ও অল্পস্বল্প সরলভাবে বোঝে। আমি ওপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে সবই দেখতে পাচ্ছি। ও মাটিতে দাঁড়িয়ে শুধু ওর নিজেরটুকুই দেখতে পায়। অনেক জানার কষ্টও অনেক।

দোতলার বারান্দা থেকে নরম গলায় দেবী ডাকলো, 'উঠে এসো। ঠাণ্ডায় ঘুরছো কেন?'

ঘরে এসে আমাদের আর কোনো কথা হলো না। দেবী জানে না বোধহয়, এইমাত্র সুকুমার চলে গেল। মালতী জানবে কাল সকালে।

আমি অন্ধকারে রঘুর বুকে হাত রাখলাম। ছোটমতো বুক ভেতরের ইঞ্জিন ভীষণ জোরে চলছে। সব সময় ধুক্‌পুক্ ধুক্‌পুক্ আমার অনেক পরেকার লোক।

॥ নয় ॥

সকালে মালতী দোতলায় মুরগীর ঘরে একবারও গেল না। আমিও যাইনি। মুরগী-ঘর থেকে ডিম তুলে এনে দৈতরি বললো, 'ক'টা মুরগী বড় খোঁড়াচ্ছে বাবু। ডিমও কম আজ। পনেরো ডজনও হয়নি বাবু।'

বেলায় কলেজ যাচ্ছিলাম। নাটকের ক্লাশ ফাঁক পড়ে গেল। কলেজ ফেরত বাড়ি এলে রঘু ছুটতে ছুটতে এসে জানালো, 'তিনটে মুরগী মরে গেছে বাবা।'

'তোর মালতীদি কোথায়?'

'ছাদে।'

সঙ্গে সঙ্গে ওপরে গেলাম। দেবী, দৈতরি, মালতী তিনজনে মিলে একটা মুরগীর ঠোঁট ফাঁক করে জল ঢালছে। জল গলে গলে পড়ছে। অনেকগুলো মুরগী খোঁড়াচ্ছে। সময় আমার ভালো

যাচ্ছে! ওদের জন্যে নগর বসালাম। ওরা চলে যাবে। অথচ নগরে এখন আগুন।

দৈতরিকে বরকতের ওখানে পাঠালাম। হাঁস মুরগী গরু ঘোড়ার চিকিৎসা করে বেড়ায়। ঘণ্টা দেড়েক পরে এসে একটা মরা মুরগীর পেট বড় একখানা ছুরি দিয়ে কচ কচ করে চিরে ফেললো। তারপর পাঁজরের ভেতর থেকে শ্বাসনালী বের করে তুলে দেখালো, 'দেখেছেন, কেমন জাম হয়ে গেছে। নাড়ীভুঁড়ি জট পাকিয়ে আছে—'

আমি আর কি বলব! গত ছ' সাত মাসে ওষুধ, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি ধরলে এক একটা মুরগীর দাম এখন বিশ পঁচিশ টাকা। অথচ যার জন্যে এতসব সেই সুকুমার এখন নেই। মালতী একবারও জানতে চায়নি, সুকুমার কোথায়। মালতী হয়তো ভেবেছে আমি কোথাও পাঠিয়েছি ওকে। দেবী বলেছিল, 'ছেলেটাকে আটকালে না?'

'আমি তো আর বেঁধে রাখতে পারি না।'

সে সময় মালতী কাছে ছিল না। আমি কলেজে বেরোবার আগে বুক পকেটে কলম গুঁজে দেওয়ার সময় দেবী দরকারী কথা বলে। যেমন, 'আচারের তেল কিন্তু ভালো দেয়নি তোমার বনমালী।' বনমালী কুণ্ডু এখানকার বনমালী অয়েল মিলের স্বত্বাধিকারী।

বরকত বললো, 'স্যার, আপনার মুরগীদের ককসিডাইসিস হয়েছে। মড়ক স্যার। এখুনি ওষুধ চাই।' যাবার সময় বরকত কাগজে কি লিখে দিল খস্‌খস্ করে। তারপর বললো, 'এখনকার মতো টেরামাইসিন দিন। না কমলে কডরিনাল এক শিশি। জলে গুলে সবগুলোকে খাওয়াবেন। তবে সে ওষুধ তো এখানে পাবেন না!'

মালতী বাজারে হরি ফারমেসিতে গিয়ে এক ফাইল টেরামাইসিন নিয়ে এল। ড্রপারে করে এক একটাকে খাওয়াতে শুরু করে দিল। আমার আবার পাঁচটা বাইশের ট্রেনে কলকাতা যাওয়া দরকার। হেড্ এগজামিনারের বাড়ি গিয়ে অন্তত দু'শো খাতা আজ দিয়ে আসতেই হবে। চারদিক দিয়ে বিপদ।

বেলা চারটের ভেতর সতেরটা মুরগী সাবাড়।

দেবী বললো, 'ও টেরামাইসিনে তোমার হবে না।'

মালতী বললো, 'তুমি তো কলকাতায় যাচ্ছ—কডরিনাল নিয়ে এসো এক শিশি।'

'আমার ফিরতে সেই লাস্ট ট্রেন। ততক্ষণে কি আর একটা মুরগীও বেঁচে থাকবে!'

'তুই যা না মালতী। কিনে দেবে'খন—তুই নিয়ে ফিরে আসতে পারবি না?'

মালতী যেমন বসে ছিল তেমন মাথা নাড়ল। মুখে কোনো ভাব নেই। শুধু ডান হাতখানা তুলে কাঁধের আঁচলটা চওড়া করে পেতে দিল। সেখান থেকেই গ্রীবা উঠে গেছে। তার ওপরে মাথা। একটা ছোট্ট জিনিস। কত সুন্দর করে কাল বিকেলে আমার বুকে ঠেসে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল।

ট্রেনে উঠে আমাদের কোনো কথা হলো না। আমি এ তল্লাটে একজন প্রোঃ।

ওকে এসপ্ল্যানেডে ছেড়ে রেখে বললাম, 'গোপাল মল্লিক লেনে খাতাগুলো জমা দিয়েই ফিরে আসবো। তুমি এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে স্টেটসম্যানের ধারে এসে দাঁড়াবে। চেনো তো?'

এই প্রথম কথা বললো, 'সেই যে ফোয়ারার ধারে—'

'সাবু গাছ আছে—'

'চিনি। ওর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখেছি। রাতে লাল-নীল আলো দেয়—'

আমার মুখে কথা এল না। এখানেও সুকুমার।

পড়ি-মরি করে ছুটে গিয়ে ডঃ ঘোষের বাড়ি পৌঁছলাম। তিনি ছিলেন না। মেয়ের হাতে খাতাগুলো বুঝিয়ে মার্কসিট জমা দিয়ে ফোয়ারার নীচে ছুটে এলাম। সাতটা সওয়া-সাতটা হবে। সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউর মাইলখানেক ওপরে একখানা গোল চাঁদ। ফাল্গুনের শুরুতেই ফুরফুরে হাওয়া। পেট্রল পাম্পের গায়ে

দাঁড়ানো রাধাচূড়া গাছটা তার সব ফুল নিওন আলোর ছটার ভেতর মেলে ধরেছে। কোনদিন মালতীর সঙ্গে আমার এমন একা একা বেরোনো হয়নি।

কিন্তু ফোয়ারার সামনে এসে ওকে পেলাম না। আজ আলো দেয়নি এখানে। দাঁড়িয়ে আছি। এখনো কেন আসে না। এদিক-ওদিক তাকালাম। কোথায়? সবাই বুঝি জানতে পেরেছে আমি মালতীর জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। ছ্যাকরা গাড়ির একজন কোচোয়ান দু'বার পাশ দিয়ে ঘুরে গেল।

খানিক এগিয়ে দেখি ফুটপাথে উবু হয়ে বসে মালতী সস্তার সিল্ক কিনছে। আমাকে দেখেই বললো, তোমার সঙ্গে টাকা হবে! এই পিশটা নিয়ে যাই—ছ'টাকা চাইছে।'

দরাদরির মন ছিল না আমার। এভাবে কিনতে দেখেই আমার বিশ্রি লেগেছে। কিন্তু উপায় নেই। আমার ভেতরকার আমি তখন দাউ দাউ করে ধরে উঠেছে।

সেলোফেন কাগজে মুড়ে দিল দোকানদার। হাসি মুখে উঠে এসে মালতী বললো, 'কডরিনাল এক ফাইল নেবে না?'

'পরে। চল আমরা খানিক ঘুরে আসি। ট্রেনের তো দেরি আছে।'

'না আমি এখন কোথাও যাব না। ওষুধ না খাওয়ালে সব মুরগী সাবাড় হয়ে যাবে। রাত হয়ে যাচ্ছে না—'

আমি কোথাও বেড়াতে যেতে চাই। সে পাঁচ মিনিটের জন্যে হলেও হোক। মালতী কোথাও যাবে না। ওষুধ নিয়েই বাড়ি ফিরবে। ফুটপাথে পা ঠেকিয়ে গোঁজ হয়ে দাঁড়ালো। দোকানদার বললো, 'যান না মা। বাবু বলছেন—কথা রাখুন।'

চোখে যতটা আগুন ধরা যায়—তাই দিয়ে লোকটার দিকে তাকালাম। কিন্তু এ সেই শ্রেণীর গাড়ল যাদের গায়ে খোঁচা দিয়ে শেখাতে হয়—এর নাম ভদ্রতা, ওর নাম বিনয়, তার নাম ভালোবাসা।

দোকানদারের কথাতেই হবে—কিংবা আশেপাশের লোকজন তাকাচ্ছিল বলেই হয়তো—মালতী আমার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগলো। আমার জানা দরকার—আজ ভোররাতে সুকুমার চলে গেলেও মালতী তার কথা একদম বলছে না কেন? মালতীকে তবে বলে গেছে? মালতী জানতো, সুকুমার একদিন যাবেই?

এভাবে অনিচ্ছুক মালতীকে নিয়ে হাঁটতে খারাপ লাগছিল। সামনেই একটা ওষুধের দোকান পড়লো। এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'কডরিনাল আছে? কডরিনাল?'

ভাগ্যিস লোকটা বললো, 'নেই।' তাহলে এখুনি আমাদের এই রাস্তা দিয়ে হাঁটা ফুরিয়ে যেত। রক্সির সামনে আমাদের সেই অল্পবয়সের রেস্তোরাঁ ঠিক আছে। দুটো পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি উঠছে। রাস্তার ওপর ছড়ানো বালির ভেতর ইঁট ছিল জানতাম না। হোঁচট খেলাম। মালতী এগিয়ে গিয়েছিল। আমাকে উঁচু হয়ে বসে থাকতে দেখে ফিরে এল। 'ও কিছু নয়', বলেই আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'সুকুমার কিছু বলে যায়নি তোমায়?'

'কি আবার বলবে! যাবার তাই গেছে। আসার হলে আসবে!'

আমি কি তাহলে সুকুমারের সিটে বসে সিনেমা দেখছি না ব্লাকে কেনা টিকিট? গরম গরম রান্না মাংসের দোকান থেকে মনমাতানো গন্ধ আসছিল। মালতীকে নিয়ে ঢুকে পড়লাম। ও খুব খুশি। এরকম বোধহয় কোনো পুরুষলোকের সঙ্গে ও কোনদিন রেস্তোরাঁয় ঢোকেনি। দু'খানা পরটার সঙ্গে ভাপানো দই মাংস মালতী খুব তারিয়ে তারিয়ে খেল। চাক চাক পেঁয়াজ কচ কচ করে কামড়ে মুখে নিচ্ছিল। আমি দেখলাম শুধু।

পর্দা ফেলা ঘর। ওর পিঠে হাত রাখলাম। অনেক ঘন হয়ে বসলো মালতী। গায়ে গা লেগে যাচ্ছিল। আমার হাতখানা ওর নাইকুণ্ডের ওপরে শাড়ির বড় গিঁটটার ওপরে গিয়ে থেমে গেল।

মালতী তখন বাঁ হাত দিয়ে আমার পিঠে একখানা মেয়েলি থাবা রাখলো, 'তুমি তো কিছুই খাচ্ছ না।'

'আমি শুধু তোমাকে দেখছি।'

'দেখার কি আছে জগদীশদা! দু'জনের হাত ফেরতা বউ আমি। আমাকে তোমার এত ভালো লাগে?'

আমি গোড়ায় কোনো কথা বলতে পারলাম না। শেষে বললাম, 'কেমন লাগে জানি না। তবে তুই আমাকে টানিস। টান, ভালোবাসা কি জিনিস আমি জানি না মালতী। দেবী তোর চেয়ে অনেক সাজানো, অনেক আঁটো। তবু তোর মতো নয়—'

খিল খিল করে হেসে ফেললো মালতী, 'আমি কেমন গো—'

'তুমি আমার মতো।' টানা দুই চোখের নীচে শক্ত চিবুক—একটি নিটোল নাক, দীঘল শরীরে প্রাণবায়ু বয়ে যাচ্ছে—এই তো যথেষ্ট। এসব বলা যায় না। বুঝবে না। বোঝে না বলেই ভালো। না জেনে মালতী যে কত মনোহারী তা ও নিজে জানে না। অথচ কাল বিকেলে এই সময় কত কি ঘটে গেল। তার কোনো ছাপ ওর মুখে পড়েনি।

আমরা লিণ্ডসে স্ট্রীটের এক দোকানে কডরিনাল পেয়ে গেলাম। এগারো টাকা চার আনা এক শিশি। ভেতরে চামচ আছে। দু' লিটার জলে এক চামচ ওষুধ দিয়ে তিরিশটা মুরগীকে খাওয়াতে হবে। ওষুধের শিশি নিয়ে মালতী আমার সঙ্গে রিক্শায় উঠলো। রাস্তার আলোয় এই প্রথম লক্ষ্য করলাম, ও আজ সিঁদুর পরেনি।

'তুমি আটটা সতেরোর ট্রেনে চলে যাও। আমি ন'টা কুড়িতে যাব।'

'তা কেন জগদীশদা? চল একসঙ্গে যাব।'

'না। তুমি আগে যাও। আমি পরে যাব।'

'ও বুঝেছি! মামীমা কি ভাবতে পারে—তাই তো?'

'না।'

'বুঝেছি।' তারপর থেমে বললো, 'মামীমার মতো মানুষ হয় না।'

'সেই তো মুশকিল মালতী। এত ভালো লোক!'

'আমারও তাই খারাপ লাগে জগদীশদা—'

'কী খারাপ লাগে—'

'তার আড়ালে—তুমি এমন সব কর—আমি করি—আমার মন কাঁটায় ভরে যায়—' রিকশাওলা বৌবাজার দিয়ে ফুলস্পীডে ছুটেছিল। দু'টি বিবর্ণ মেয়ে দু'খানা খালি রিক্‌শার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো। খদ্দের নেই। স্টেশনমুখো ব্যস্ত লোক ছুটছে। ফুলকপির শাদা পাহাড় রাস্তার দু'ধারে। দোকানের নিওন আলোয় সেগুলোও পড়ে আছে।

মালতীকে বললাম, 'তুমি শুধু বলে যাও—আমি তোমাকে ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি—'

'তাতে কি হয়!'

'আমি তেজী থাকি মালতী। আমাকে কেউ কোনদিন বলেনি। আমি রোজ ভেতরে ভেতরে শুকিয়ে যাচ্ছি। আমি অনেক কিছু করতে পারি। আমার অনেক কিছু করার আছে। আমাকে পেছন থেকে বার বার বলতে হবে—বাক্ আপ, বাক্ আপ জগদীশ—তাহলে আমি রেসের এক নম্বর ঘোড়ার চেয়েও আগে আগে ছুটতে পারি।'

মালতী না বুঝে বললো, 'তাই বুঝি?'

'আমার সব শক্তি এই সামান্য সংসার করে ফুরোয় না মালতী। আমার এই ইঞ্জিন কোনদিনই পুরোপুরি চালানো হয়নি।'

'মামীমা তোমাকে ভীষণ ভালোবাসে।'

'কোনদিন টের পাইনি। আমাকে তেমন করে কেউ কোনদিন জাগায়নি।'

'সব ভালোবাসা বোঝা যায় না।'

'কিছু কিছু বোঝা যায়।'

'তোমাদের সুকুমার কোনদিন কিছু বোঝেনি। প্রথম যেবার য়েয়ে বসলাম—ও শুধু ইনিয়ে বিনিয়ে লিখতো—আমি মরে যাব লতী—আমি মরে যাব। তুমি এস। কত কি····!'

'ওরা তোর দাম দেবে না মালতী। আমরা যারা ফুরিয়ে াচ্ছি—' আর বলা গেল না। মানে হয় না কোনো বলে। লাভ নই। এসব কথা ওর বুদ্ধির বাইরে। আমি যে অনেককাল গ্যের পাতলা সুতো ধরে মরণ-বাঁচন ঝুলেছি। যে কোনো সময় সে পড়তে পারতাম। একেবারে শ্রীঘর। নয়তো স্বর্গে—কিংবা রকে বোধহয়।

স্টেশনের কাছে আমি নেমে গেলাম। ওর রিক্‌শা ভেতরে লে গেল। আমি এখন প্রায় ঘণ্টাখানেক এদিক সেদিক ঘুরবো।

টাওয়ার হোটেলের নীচে দাঁড়িয়ে মনে হলো, আমি আজ কিছু জয় করেছি। কিন্তু সে নেশা খানিক পরেই ফিকে হয়ে গেল। আমার যা বয়স—আর ক'বছর পরেই এমন সব লোকের স্ট্রোক হয়। পয়সা থাকলে ছুটি কাটাতে বেরোয়। দুঃখ থাকলে মানসম্ভ্রম াঁচিয়ে গোপনে নেশা করে। অথচ আমি তো কোনোটাই করছি না।

আজ কলকাতার বিয়ে। এমন চাঁদ উঠেছে। সারাদিনের ধুলোময়লা জ্যোৎস্নায় বাহারি রং মেখে বসে আছে। আমি জীবনের এতদিন পরে—এই প্রথম বুকের কবাট ফাঁক করে ধরে মালতীকে রক্তমাখানো কতকগুলো তাজা সত্যি বের করে দিলাম। আমার এসবের পক্ষে এখন একমাত্র শত্রু গত ক'বছরে সাজিয়ে তোলা আমারই এখনকার পরিচয়। প্রোঃ জগদীশ রায়। ফাইভ ইন ওয়ান। ফুল্লশ্রীর ধারে একটা ছোট জায়গায় আমি একজন লোক—একজন ভদ্রলোক—একজন সচ্চরিত্র গৃহস্থ। উঃ! আজ যদি আগেকার জগদীশ বেঁচে থাকতো। ফিরে আয় জগদীশ, একবারটি!

ট্রেনের জানলায় বসে আমারই সঙ্গে আমারই কথা হচ্ছিল।

প্রো ঃ জগদীশ ঃ আমি ফাইভ ইন ওয়ান। রঘুর বাবা, দেবীর স্বামী, দৈতরির বাবু, সুকুমারের মামাবাবু, মালতীর জগদীশদা।

পুরনো জগদীশ ঃ উঁহু। মালতীরও বাবু।

ঃ না। লাভার। প্রেমিক। প্রণয়ী। ও আমার বুকের দরজা খুলে দেয় রোজ।

ঃ থামো! তুমি পরিষ্কার ওর একজন বাবু। পাছে ধরা পড় তাই বাইরে বাইরে জগদীশদা। মামাবাবু। ভেতরে ভেতরে লাভার। প্রেমিক। প্রণয়ী।

আমি হাত থেকে মাদুলিটা খুলে বাইরে ধানক্ষেতে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

বাড়ি ফিরতে রাত দশটা পেরিয়ে গেল। একতলায় কেউ নেই। দোতলার ছাদে আলো জ্বলছে। কুয়োতলার দরজা খোলা ছিল। পেছনের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলাম। দেবী উঁচু মোড়ায় বসে পুরনো মোজা খুলে উলের ঘুঁটি পাকাচ্ছিল। দৈতরি অনেকগুলো আধমরা মুরগী একত্র করে ডালায় সাজিয়েছে। কডরিনালের শিশির অর্ধেক খালি মালতী পিঁড়ি পেতে বসে ড্রপারে ওদের ওষুধ খাওয়াচ্ছে। সেই মোটা মোটা পাখিগুলোর কি দশা।

দেবীর দিকে তাকালাম। এসব ওকে ছুঁতে পারেনি।

মুরগীগুলো ভেতরের ব্যথায় দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে। মালতী ঠোঁট ফাঁক করে ছুঁচলো জিভের ওপর ওষুধ ফোঁটা ফোঁটা করে ঢেলে দিল। এরকম জায়গায় আমাকে আমার পাকা অভিনেতা লাগলো। পায়ের কালো পাম্পসুতে আলো পড়ে চিক চিক করছে। ধুতির কোঁচা মাপমতো ঝুলে। মাথার চুল পাট-পাট আঁচড়ানো। মুরগী নামক এই কুটীরশিল্পের আমিই উদ্যোক্তা— উপরন্তু এই বাটিকার গৃহস্বামীও আমি। অথচ কোনটার ভেতরেই নেই।

উদ্বেগ ফোটাতে গেলাম। নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না,

তাই হলো না। কেননা ঘণ্টা দুই আগেও আমি আর মালতী রেস্তোরাঁয় বসে ছিলাম। তখন তো ককসিডাইসিসে আক্রান্ত মড়ক-লাগা এই মুরগীগুলোর কথা একটুও মনে ছিল না।

এখন আমি একটা ট্রেন পরে ফিরেছি খাতা জমা দিয়ে—অন্তত তাই আমি দেখাতে চাই। এই হলো আমার সৎ হওয়ার চেষ্টা। সততা প্র্যাকটিসের নমুনা। সাধে আমি জগদীশ রায়কে বলেছিলাম—কনসেসন দাও—অনেকদিনের দাগী আসামী তুমি ভাই। একবারে কি সৎ হওয়া যায়! টাইম নাও। ফিরে গোড়া থেকে ট্রাই করো।

আমি ওরই ফাঁকে দু'দুবার মালতীর চোখে সরাসরি তাকালাম। মালতী কিন্তু একবারও চোখের পলক ফেললো না। কি হলো। গণ্ডগোলটা কোথায়। সুরে তো মিলছে না।

ঠিক তখুনি কালিঝুলি মাখা সুকুমার একটা বড় পিচবোর্ডের বাক্সে আরও একগাদা মরা মুরগী নিয়ে খাঁচার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। খালি গা। পায়জামা গুটিয়ে কোমরে গুঁজে নিয়েছে। ঘেমে একাকার। লিটারের বেঁটে ছাদ মাথায় ঠেকতে পারে। তাই কুঁজো হয়ে কোনক্রমে ছাদে এসে দাঁড়ালো।

কোথায় যেন মিলছে না। 'তুমি কখন এলে?'

'আটটা সতেরোয়—'

আমি চুপসে গেলাম। তবু হাসি হাসি মুখ করে বললাম, 'মালতীও তো ওই ট্রেনেই ফিরেছে!'

'হ্যাঁ। স্টেশনে নেমেই দেখা হলো।

আজ ভোররাতে সুকুমার চলে গিয়েছিল। এখনো জানি না, মালতীকে ও বলে গিয়েছিল—না ঝোঁকের মাথায় কালকের বিকেলের ঘটনার পর ও হন হন করে জ্যোৎস্নায় কেটে পড়ে—সেই শেষরাতে। ফার্স্ট ট্রেন ধরবে বলে।

দৈতরি মহা ফুর্তিতে কাজ করে যাচ্ছে। ক'টা বার্ড বেঁচে যাবে বোধহয়। তারা রেসপন্স করেছে। ওদের আঁতুড়ঘর ব্রুডার বক্স এখন এক রকম মোবাইল হাসপাতাল। দৈতরি তার ভেতর চল্লিশ

ওয়াটের একটা ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিয়েছে—খোপে খোপে খড় বোঝাই করেছে, সেখানে একসঙ্গে তিনটে চারটে করে মুরগী শোয়ানো। যেগুলোর অবস্থা খুব খারাপ—সেগুলো আলাদা এক খোপে সেপারেট করে রাখলো দৈতরি।

অনেকদিন পরে—তা কেন? এই প্রথম নিশ্চয়—সুকুমার রীতিমতো কমাণ্ড করে মালতীর সঙ্গে কথা বললো। আমার ভীষণ নতুন লাগছে।

'নাও চটপট উঠে পড়। ওগুলোকেও সেঁক দিতে হবে—'

কিরকম সুকুমার চলে গিয়েছিল আজ ভোররাতে, আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার তফাতে কেমন অন্য সুকুমার ফিরে এসেছে। আশ্চর্য!

মালতী উঠলো। আমার দিকে একবারও তাকালো না। অথচ এই সুকুমারের কথাই আজ সন্ধ্যেয়—কয়েক ঘণ্টা আগে কেমন অন্য গলায় বলেছিল মালতী। মেয়েলোক। সেক্সপীয়র তুমিই জানতে! কত বদলায়। কত ঘন ঘন।

আমার যা বয়স তাতে পা ছড়িয়ে বসে শোক করা যায় না। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি কিছু একটা হয়েছে। কিছু একটা হতে চলেছে। আমার ভেতর অবধি আমি জেনে ফেলেছি প্রায়। শুধু ঠিক ঠিক এখনো ধরা যাচ্ছে না। কাউকে একা না পেলে এসব কথা সরাসরি বলা যায় না।

দেবী তার হাতের কাজ একটুও থামায়নি। একপাটি পুরনো মোজা দেখতে দেখতে গোড়ালি অবধি খুলে ফেলেছে। সবকিছু স্বাভাবিক চলছে।

হোস্টেলের দোতলার বারান্দায় ছেলেরা হৈ হৈ করে রাতের খাওয়া সেরে উঠলো। ফট করে সুকুমার বললো, 'আমি চাকরি পেয়েছি মামাবাবু।'

'বাঃ! গুড নিউজ। এতক্ষণ বলনি কেন?'

'সময় পেলাম কোথায়! সেই ভোরে গেছি। আপনার এদিকে বিপদ যাচ্ছে—'

'তা যাক। মুরগী আসবে যাবে—মরবে—জন্মাবে।' আমি কি আমার গলায় কথা বলছিলাম! ছেঁড়া ধুতিতে গোটা সাতেক আধমরা মুরগী জড়িয়ে ল্যাম্পের কাছাকাছি বসিয়ে দিল মালতী। সুকুমার এগিয়ে গিয়ে ব্রুডার বক্সের ঢাকনা নামিয়ে দিল, 'আপনি আমাদের জন্যে এত করলেন—আর এটুকু পারব না! আপনার মুরগীগুলো বাঁচাতে হবে তো—'

'কেন? এসব তোমাদের নয়?' বলা গেল না: আমি তো কোনদিন আমার জন্যে এই পোলট্রি করিনি। এ তো তোমাদের জন্যেই।

'আগে ছিল। এখন আর নয়।'

কিন্তু আজ বিকেলেও ছিল। মালতী কত ছোটাছুটি করে ওষুধ কিনল ওদের জন্যে।

'কেন?'

'আপনার জিনিস আপনি দেখুন। এত খরচা করলেন—তাছাড়া আমি তো চাকরি পেয়েছি। আপনার বিপদ কাটলেই আমরা চলে যাব।'

'বিপদ বুঝি এখন আমার একার!'

সুকুমার মাথা নীচু করে রইলো। মাথার চুলের ঢেউ ভেঙে কপালে পড়েছে।

আমি ঘাবড়াবার লোক নই। কিন্তু যার জন্যে এতখানি জলে নামলাম—তারাই—তারাই একলহমায় পালটে গেল। গুণ আমি কাউকে করতে পারিনি। গুণ করেছে সুকুমার। আমাদের সবাইকে। আমরা এতদিন সবাই মিলে সামিয়ানা সাইজের একখানা ১০১ নম্বর রুমালে বসেছিলাম। সবচেয়ে বেশি বশ করেছে মালতীকে।

এতক্ষণে দেবী প্রথম কথা বললো, 'তুমি বাধা দিচ্ছ কেন? ওরা যদি চাকরি করে নিজেদের মতো সংসার চালাতে পারে তো ভালোই।'

চমৎকার। তাহলে এই সাত-আট মাস আমি যে টাকাপয়সা

ঢেলে গেলাম? সে সব? কম মাথা ঘামিয়েছি! এক কথায় স বরবাদ করে দিলে। ভালো!

একটু বেশি রাতে সবাই একসঙ্গে খেতে বসলাম। ফুলকপি ডালনা দিয়ে ভাত মেখে খাচ্ছি—বার বার মনে হচ্ছে ব্লটিং পেপারে গোবর মাখিয়ে খাচ্ছি। মুখের ভেতরটা আগাগোড়া খারাপ লাগলো। সেই একই জিনিস দৈতরি মেঝেয় বসে মহা আদরে খেয়ে যাচ্ছে।

'খুব ফুর্তি যে তোর?'

দেবী বললো, 'হবে না! আজু ফিরে এসেছে।'

'তাই নাকি। —কি রে, বলিসনি তো?'

'সব তোমাকে বলবে? কি ভেবেছ!'

'তা এতবড় একটা খবর বলবে না!' থেমে বললাম, 'বাড়ি গেছি কবে?'

মাথা নীচু করেই দৈতরি জানালো, 'এর মাঝে একবার ঘুরে এসেছি। ধানকাটার সময় পার হয়ে যাচ্ছিল বাবু। বিঘেটার জায়গায় বোরো ধান দিয়েছিলাম। ফলনও খুব জম্পেস। কি এক বিদঘুটে পোকার উপদ্রব। বাবা বুড়ো হয়ে গেছে। তাই মাঝে মাঝে গিয়ে কেটে আসি খানিক খানিক। আর একবার ছুটি নিয়ে গিয়ে আছড়ে আসব।'

এত কথা জানতে চাইনি আমি। আমার জানার ইচ্ছে ছিল আজু কেমন করে ফিরে এল। খোকাখুকু এতদিন বাদে মাকে দেখে ছুটে গিয়েছিল? ময়ুর কোথায় ছিল?

'খুব পেটন দিলি বল।'

'জোর পেটন দিচ্ছিলাম বাবু। আমি তো গোড়ায় বুঝতেই পারিনি, কে দাঁড়ানো!....এমন এক বিচ্ছিরি পোকা এসেছে বাবু—রাতে রাতে আসে ভোর ভোর চলে যায়—ধরা যায় না, মারা যায় না। অথচ ঢালা ক্ষেতময় কুটি কুটি ধান পড়ে আছে। কে তুলবে?'

'আজুর কথা বল।'

'খুব রোগা হয়ে গেছে। চেনাই যায় না। আমি বসে বসে ান খুঁটছিলাম। ওকে দেখেই উঠে দাঁড়ালাম। সেখান থেকেই পটাতে পেটাতে বাড়ির দোরে—'

'ময়ূর ছিল ?'

'সে অপগণ্ড কোন্ চুলোয় কে জানে—আমার তো জ্ঞান ইল না।'

'শিল-নোড়া এনেছিলি ?'

'খোঁজ করতাম। কিন্তু তা আর হলো না, বাবু।'

'ছেড়ে দিলি তাই বলে—'

'খুব হাতের সুখ করে নিচ্ছিলাম। কিন্তু বাদ সাধলো মা। াঝখানে পড়ে বাধা দিয়ে বললে—ও কি করছিস, ঘরের বউকে অমন পটাতে আছে ? নে ঘরে তুলে নে।'

'তাই বলে নিলি !'

খাওয়া থামিয়ে দৈতরি বোকার হাসি হেসে বললো, 'কি করবো াবু! মাদৃ আজ্ঞা।'

'কি ?'

'মাদৃ আজ্ঞা।'

'কথাটা পেলি কোথায় ?' সুকুমারও হাসছে। এই প্রথম ও সামার সঙ্গে খেতে বসেছে। মালতী কিন্তু মাথা তুললো না।

'আপনারা বলেন—তাই শুনে শুনে। বাবা শুনেছি—মামার জন্মের আগে ভদ্দরলোক ছিল। তার মুখেও ছু' একবার শুনেছি।'

'ও।'

ওরা দু'জনে আজ তাড়াতাড়ি শুতে গেল। খেয়ে উঠে আমারও কেন বার বার মনে হলো, হেরে গেছি, হেরে গেছি। চিরকাল পানের দঙ্গে সিগারেট ধরাই। আজ ধরালাম না। আচ্ছা, সত্যি সত্যিই কি আমার মালতীকে জয় করার মতো এমন কোনো কারণ আছে—যেজন্যে আমি লাইফ স্টেক করেও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি !

আমার জন্মলগ্নে হয়তো কোনো তারা খসে পড়েছিল। নাও পড়তে পারে। এমন কিছু বিশেষ কেউ না আমি। মালতীকে না পেলে আমায় কেউ দুয়ো দিচ্ছে না তো। তবু। তবু বুঝি না, মালতী কি, কেমন, কেন? শুয়ে পড়ে দেখলাম, অন্যদিনের মতোই দেবী আজও ঘুমিয়ে পড়েছে। ও নিজেও একজন মেয়েমানুষ। কোনো ভাবলেশ নেই। নিখুঁত। কোথাও দাগ পড়েনি।

আমি শুয়েও শুতে পারলাম না। খুট করে দরজা খুলে লবিতে এলাম। তারপর তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে একদম নীচে। স্কাইলাইট বেয়ে বিরাট এক চৌকো জ্যোৎস্না বারান্দায় পড়েছে। মালতীদের ঘরের দোর শক্ত করে আটকানো। সেখানে আমারই একটি নির্বাক ছায়া মাত্র।

ভেতর থেকে কিছু হাসি, কিছু কিছু কথা ভেঙেচুরে একটু-আধটু বেরিয়ে আসছিল। আমি চুপচাপ গিয়ে দোরে কান পেতে দাঁড়ালাম। এখন আর আমি এই নিশুতি রাতে যশস্বী লব্ধপ্রতিষ্ঠ ফাইভ ইন ওয়ান প্রোঃ নই। মনে হলো আমার নাম উঠলো ওদের কথায়। যতদূর পারি কান চেপে ধরে রইলাম। কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। আমার কণ্ঠ হওয়ার কথা। কি যে হচ্ছে ভেতরে কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও কানে কিছু গেল না। আজ ওদের খুব সুখ। আজ কতকাল রাগ, শোক, দুঃখ চেপে চলার কসরত করে আসছি—ভদ্রলোক হয়ে ওঠার সে সব ঝকমারি সবই প্র্যাকটিস করে আসছি। অথচ অল্পক্ষণের ভেতর সুন্দরভাবে খাঁটি, পুরনো পুরুষলোক আমার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এল।

আর দাঁড়ানোর মানে হয় না। আমি কি ভীষণ ব্যর্থ!

'বাবু, এখানে কি করছো—'

'কে?'

'আমি দৈতরি বাবু। তুমি এই আঁধারে?'

'দেশলাই খুঁজছিলাম। তুই কেন রে এখন—এখানে?'

'একটা দড়ি নিতে এসেছি। বিছানা বাঁধবো। কাল দেশে যেতে হবে না!'

'কালই যাবি!'

'যাব আর আসবো। ধানটা শুধু তুলে দিয়ে ফিরে আসবো।'

দড়ি যোগাড় করে বেরোতেই আমিও দৈতরির সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এলাম। সন্ধ্যের কলকাতার সেই একই জ্যোৎস্না। আরো ক্লিয়ার। আরও বড় চাঁদ। আমি পেছন পেছন হরীতকীতলায় ওর ঘর অবধি যাচ্ছিলাম।

'ঠাণ্ডায় আর এসো না। শুয়ে পড়গে—'

'তোর দেশে কি করে যায় লোকে—'

'কেন, হেঁটে। ফুল্লশ্রী ধরে চলে যাবে। নবগ্রহতলা বাঁয়ে ফেলে মাইল দুই পথ। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁটলেও আধঘণ্টা বিশ মিনিটের রাস্তা।'

॥ দশ ॥

সকাল ন'টায় ঘুম থেকে উঠে রঘুর মুখেই প্রথম খবর পেলাম। মোটমাট একচল্লিশটা মারা গেছে। তিনটের অবস্থা এখনো কাহিল। বাকি মুরগীগুলো অনেকটা সুস্থ।

জানলা দিয়ে রোদ এখন আমার বিছানায়। অনেকদিন সবজি-খেতে নামিনি। টমেটো গাছে কতকাল জল দেওয়া হয়নি। খানিকদূর থেকে গরুটা আমারই দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওর টান এড়ানো গেল না। কলেজ বসতে এখনো ঘণ্টাখানেক।

ঘাস খেতে খেতে মুখ তুলে দাঁড়িয়েছিল। আমি গিয়ে দাঁড়াতেই গলা উঁচু করে দিল। খানিকক্ষণ হাত বুলিয়ে দিলাম। মাথা নীচু করে ঘাসে মন দিল। যেই চলে যেতে চাই—অমনি মাথা তুলে ফেলে। ওকে ছেড়ে আসতে আধঘণ্টার ওপর সময় চলে গেল।

বারান্দায় চায়ের কাপ ধরে দেবী দাঁড়ানো।

'তুমি?'

'বাঃ। দিতে নেই বুঝি!'

চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে খেয়াল হলো এ ক'মাস মালতীই চা দিয়েছে, কফি দিয়েছে—সকালে বিকেলে।

'দৈতরি নেই?'

'কেউ নেই।'

আমি তাকিয়ে আছি দেখে দেবী বললো, 'দৈতরি ভোর ভোর দেশে গেছে। ধান কেটেই ফিরবে।'

'মালতী?'

'ওরা তো এই একটু আগে বেরিয়ে গেল। ট্রেন কি পাবে!'

'চলে গেল!'

'যায়নি। যাবে। সুকুমার চাকরি পেয়েছে গেঞ্জির কারখানায়। বালিতে। ঘর নিয়েছে পঁচিশ টাকায়—'

'মাইনে কত?'

'তা কে জানতে গেছে। ছেলেটা মহা পাজি কিন্তু—এই ভোরবেলা মেয়েটাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল।'

'বাঃ। এ তোমার কেমন কথা! নিজের বউ।'

'তাই বলে আজেবাজে মন নিয়ে কালীঘাটে যাবে?'

'কালীঘাট? কেন বলো তো?' কি ব্যাপার। শেষে ভুলিয়ে-ভালিয়ে মালতীকে বেচে দেবে না তো। হলুদবর্ণ চোখ সব সময়। জ্যোৎস্নায় মিশে যায় একেবারে। মাথায় ঢলে-পড়া মৃণালের ধারায় চুলের থাক। সুকুমারের পাস্ট আমি বিশেষ কিছুই জানি না। কোন্ মতলবে বেরোলো এই সাত সকালে!'

'কিছুতেই যাবে না মালতী—'

'যেতে দিলে কেন তাহলে? আমায় ডাকলে পারতে।'

'তুমি তো ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছিলে। আমিই ঠেলেঠুলে পাঠালাম।'

'তার মানে—'

'পুরুষের মন। আমি তো জানি!'

বিস্মিত, অবাক—যা কিছু হওয়ার আমি হয়ে গেছি। কিছু বুঝতে পারছি না। দেবীর এবার দয়া হলো। ভেঙে বললো, 'পুরুষ মানুষ তো হাজার হোক। সন্দেহ ঢুকেছে মনে!'

আমার ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা জল বয়ে গেল। তবু হাসি ভাসিয়ে তাকিয়ে রইলাম।

'সতীত্ব পরীক্ষা করাতে কালীঘাটে নিয়ে গেলেন বউকে। মায়ের বাড়িতে দাঁড়িয়ে সত্যি কথা বলতে হবে। ভালো রে! তার জন্যেই মেয়েটা মরে। মাদুলি নিল। ফুল্লশ্রীর ধারে শ্মশানে গেল পুজো দিতে—এই তো সেদিন—'

আমার ফস্ করে মনে পড়ে গেল, মালতী বলেছিল, বলো জগদীশদা—আমি সতী না, আমি সতী না? এই তো সেদিন। ওরা এসেছে তো মাত্র ক'মাস। এর ভেতরেই চলে যাবে। আমরা তিনজন—আমি, দেবী, মালতী—আমরাই আদি মানুষ। আমরা দুঃখ বুঝি, ভালোবাসা বুঝি, সুখ জানি। সুকুমার এসব বোঝে না। জানে না। আমাদের চেয়ে নতুন, নিষ্ঠুর। ভালোবাসা ব্যবহার হলেও ফুরোয় না। বেড়ে যায়। ভগবান সাক্ষী করে ও মালতীর ভেতরটা জেনে নিতে চায় এখন।

'আমি চা দিলে তোমার খারাপ লাগে!'

'এই ত্যাখো। কে বললো!'

'অমন করে তাকালে যে বড়—'

'তুমি তো কোনদিন কৈফিয়ত চাওনি দয়া—'

'দয়া কে?'

'যদি বলি তুমিই দয়া।' বুঝলাম, আমার পাতানো নাম একদম মনে নেই।

'কি বাজে বকে চলেছ—'

'আমি সত্যি বলছি দয়া। আমি তোমায় মনে মনে দয়া

বলেই ডাকি। তুমি আমাদের চেয়ে অন্যরকমের লোক। ক্ষমা করতে পার। তোমার কাছে আশ্রয় পাওয়া যায়। শেলটার্ নেওয়া যায়।'

'তাই বুঝি! কোথায় এমন কি করে এসেছ ওগো—আশ্রয় না হলে চলবে না!'

'অনেক কিছু করেছি। কিছুই মনে থাকে না আমার। মুখে ছাপ পড়ে না কোনো। তুমি কিছু জানো না।'

'জেনে কাজ নেই। এবার চান করতে যাও। নয় কলেজে লেট হবে।'

খেতে বসে বুঝলাম একা একা খাওয়া যায় না। রঘু ছাদে। দেবী মনোমতো একটা কিছু খাবার বানাচ্ছে আমার জন্যে। তুপুরে কলেজে পাঠিয়ে দেবে হয়তো।

ক্লাশে বসেই দেখলাম, বেলা দেড়টা নাগাদ সুকুমার আর মালতী আমাদের কোয়ার্টারের সামনে রিকশা থেকে নামলো। হাতে ঠোঙা মতো—শালপাতার হবে, কালীবাড়ির প্রসাদ।

আমি শেষ ক্লাশটা না নিয়েই বাড়ি চেলে এলাম।

দেবী ছুটোছুটি করে ওদের খেতে দিচ্ছে।

সুকুমার আমার দিকে তাকালো, 'বুঝলেন মামাবাবু—আপনাদের এদিকে ট্রেন বাড়ানো দরকার—যা ভিড়!'

কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল না। তবু বললাম, 'আস্তে আস্তে বাড়বে।'

ওরা যে এসেই রওনা হয়ে যাবে ভাবতে পারিনি। মালতী মাথা নীচু করে খেয়ে নিল। আঁচাতে উঠে বললো, 'এত বেলায় কি খাওয়া যায় মামীমা—'

কাল সন্ধ্যের পর আর কথা হয়নি আমার সঙ্গে। সুকুমার বেডিং বাঁধছিল। মালতী আমাকে একা পেয়েই বললো, 'তিরিশটা টাকা দেবে আমায়? নতুন জায়গায় যাব। হাতে টাকা নেই মোটে।

পুরনো অভ্যেস মতো তিনখানা পাকানো দশ টাকার নোট টেবিলের এক কোণ থেকে বের করে দিলাম।

যাবার আগে এক ফাঁকে মালতী ছাদে উঠে গিয়ে মুরগীদের জল পালটে দিল। সবে অসুখ থেকে সেরে উঠে ওরা চনমনে হয়ে উঠেছে। মালতীকে দেখেই বোধহয় ওরা সবাই এক সঙ্গে কঁ-কঁ করে ডেকে উঠলো।

নীচে রিকশায় বসে সুকুমার ডাকলো, 'এরপরে কিন্তু ট্রেন মিস হয়ে যাবে—'

ছাদ থেকে মালতী বললো, 'যাচ্ছি। খবরটা দিয়ে যাই—'

দুটো রিকশা এসেছে। যাবার সময় মালতী দেবীকে টেনে নিল, 'আমাদের তুলে দিয়ে ফিরে আসবে মামীমা।'

ওদের রিকশা মোড় ঘুরে মিলিয়ে যেতেই আমিও বেরিয়ে পড়লাম। স্টেশনের উল্টোদিকে ফুল্লশ্রী। নদীর ধারে ধারে ভাটফুলের জঙ্গল। রঘু এখন স্কুলে। অনেকটা চলে এসেছি। আশেপাশে লোকজন নেই। ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার ইলেকট্রিক হর্ন শুনতে পেলাম এক সময়। বেলা তিনটে পৌনে-তিনটে হবে এখন। এক ঢাল মেঘ এসে রোগা নদীটার বুকে ছায়া ফেলে দিল। নির্জনে বাতাস গাছপালার গা ধরে নাড়ানাড়ি করে যাচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে নবগ্রহতলায় এসে পৌঁছলাম। শ্মশানের সেই অশ্বত্থতলা ফেলে এসেছি। আজ সেখানে দুটো মড়া ছিল।

বিকেল পড়ে যাওয়ার আগে একরকমের ঠাণ্ডায় সারা তল্লাট ভরে যায়। নদীর পাড়ে মাটির গর্ত দিয়ে খুশির ঝলকের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে গাঙশালিক বেরিয়ে আসছে—আবার গর্তেও ফিরে যাচ্ছে। আমি কোথায় ছিলাম। এখন কোথায়। নগর বসাতে গিয়ে যত দুঃখ!

এখন নিশ্চয় এক ছাদ মুরগী জলের জন্যে খালি বালতিটা ঠোকরাচ্ছে। যা যুগ যাচ্ছে তাতে সুকুমার হওয়াই ভালো। পরশু

বিকেলের দিকে 'তবে রে—' বলে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আজ খেতে বসে বললো, 'মামাবাবু বলেছিল, আপনাদের এখানে ট্রেন বাড়াতে হবে—বড় ভিড়।' কিরকম নির্বিকার। মানুষ এইরকম হয়!

নবগ্রহতলা ফেলে একটা উঁচু মাটির বাঁধের রাস্তা চলে গেছে। হু'ধারে মাটির ঘর, নিকোনো উঠোন, ছেঁচা বেড়ার দেওয়াল। কারও চালে পাকা লাউ ঝুলছে। বড় বড় মাদার গাছ অনেকখানি জুড়ে ডালপালা মেলেছে।

এমন চোখ জুড়োনো ছবি দেখতে দেখতে বেশ হেঁটে যাচ্ছিলাম। এক সময় গ্রাম ফুরিয়ে গেল। দৈতরি বলেছিল—এদিকেই কোথায় থাকে!

যাবার সনয় মালতী মাথা নীচু করে আমায় প্রণাম করেছে। ছুটোছুটি দৌড়ঝাঁপে চোখ বসে গেছে। সারারাত তো ঘুমোয়নি আজ ওর সতীত্ব পরীক্ষা গেছে কালীঘাটে।

আবার একটা গ্রাম পেয়ে গেলাম। এ তল্লাটে চারদিকে বোরো চাষের ধুম। যে যেখানে পারে রুয়ে দিয়ে বসে আছে। জল পেল কোথায়? রাস্তাটা উঁচু হয়ে গেছে। খানিকক্ষণ ঠেলে ওঠার পর বোঝা গেল। বিরাট একটা বিল কালো জল নিয়ে পড়ে আছে। এখানে সেখানে জমাট দাম। তার ওপরে গোলাপি রঙের শাপলা ফুল ফুটেছে। এক এক জায়গায় বক উড়ছে। বিলটা তাহলে কত বড়। এসবের সামনে দাঁড়ালে আমি খুব ছোট হয়ে যাই। বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারি না।

বিলের দু'ধার দিয়ে সবাই জল ছেঁচে নিয়েছে মাঠে। অসময়ের পাকা ধানে রাজ্যের ফড়িং উড়ছে। রাস্তার এপারে গাছগাছালির ভেতর থেকে একঝাঁক টিয়া বেরিয়ে এসে ধানে গিয়ে পড়লো। কেউ কাটছিল, কারও কাটা হয়নি—সবাই এক সঙ্গে হা হা করে উঠে দাঁড়ালো। কত জায়গা জুড়ে শুধু সোনালী রং। তার ভেতর থেকে কালো রঙের জোয়ান, বুড়ো, বউমানুষ—সবাই পাখি তাড়াতে উঠে দাঁড়িয়েছে। সবুজ রঙের পাখিগুলো বসতে না পেরে আবার উড়তে

লাগলো। জায়গা চাই জায়গা চাই। লাল ঠোঁট রোদ পেলেই জ্বলে উঠছে। কত রং এখানে।

এতগুলো লোক ধানক্ষেতে নেমে কাজ করে যাচ্ছে। ইচ্ছে করলেই কাছে যাওয়া যায়। মাঝখানে খানিকটা করে নাবাল জমি। সেখানে ভেলভেটের মতো পুরু দূর্বা। তবু গেলাম না। চিরকালই পাম্পসুর ডগা আমি যতদিন পারি বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলি। ভাঙাচোরা জুতো পায়ে দেওয়ার চেয়ে না দেওয়াই ভালো।

আমাদের দৈতরি কোথায়! এটা কি তাদের গ্রাম!

একটা বছর পনেরোর ছেলে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করতেই সে আঙুল তুলে দেখালো, 'উই যে—'

তাহলে ঠিক জায়গায় এসেছি। ভালোই হলো। ছেলেটা ভাত নিয়ে এসেছিল মাঠে। একপাল বাছুর তাড়িয়ে ফিরছে। মাথায় কলাপাতায় ঢাকা কলাই বাসনপত্র গামলায় চাপানো। দৈতরি বলে থাকে—গামলি। থালাকে বলে—বেলি।

ছেলেটা খানিক গিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়ালো, 'ডেকে দেবো?'

'থাক থাক, আমিই যাচ্ছি—', দেখতে পেয়েছি। পেছন ফিরে মাটি থেকে ধান খুঁটে খুঁটে তুলছে দৈতরি। মেয়ে-মদ্দ বাচ্চা-বুড়ো সবার হাতের কাছেই ধামা। অল্প অল্প ভিজে মাটি থেকে ধান খুঁটছে উবু হয়ে।

দৈতরিকে আমি যে কোনো দিক থেকেই চিনতে পারি। এখান থেকেও ইলেকট্রিক ট্রেনের বাঁশী শোনা যায়। এইসব গাছপালা পার হয়ে কোথায় রেল লাইন শুয়ে আছে বোঝার উপায় নেই। পৃথিবী হওয়ার পর গাছপালা, নদীর সবচেয়ে কাছাকাছি জিনিস রেলের দু'টি পাটি। সব সময় একসঙ্গে থাকে। এতক্ষণে মালতীদের ট্রেন কলকাতায়।

আবার টিয়ার ঝাঁকটা ফিরে এল। ধীর স্থির থমথমে মুখের একজন বউমানুষ উঠে দাঁড়িয়ে হেই হেই করে তাড়িয়ে দিল। তারপর যার পাশে হাসিতে ভেঙে পড়ে বসতে গেল—সে আর কেউ নয়—আমাদের দৈতরি।

আমি উঁচু বাঁধের রাস্তায় উবু হয়ে বসলাম। জায়গাটা ঢিবিমতো। ঘন দূর্বায় মোড়া। দক্ষিণ থেকে হাওয়া আসছিল। আমার বুক অবধি ভিজে যাচ্ছে। এই তাহলে আজুবাঈ।

দৈতরি কি একটা বললো।—ফিরে আজু হাসতে লাগলো। মাথার ওপরে টিয়ার ঝাঁকটা ফিরে এসেছে আবার। ওদের খেয়াল নেই। কাছেই কাটা ধান শুকোচ্ছে। বিচালির লোভে নাকাল পরানো গরু দু-একটা মাঠ শুঁকে বেড়াচ্ছিল।

আমারও খেয়াল ছিল না। টিয়ার ঝাঁক তাড়াতে আমিই 'হেই হেই' করে উঠলাম।

অচেনা গলার আওয়াজে দৈতরি ফিরে তাকালো। তারপর আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালো, 'বাবু—!' এক ছুটে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো, 'কখন এলেন? খবর দিয়ে আসতে হয়—'

পায়ে পায়ে একেবারে ধানক্ষেত থেকে আজুবাঈ উঠে আসছিল। হাতের আঙুলগুলো কেমন এখান থেকে বোঝার উপায় নেই। ও জানে, আমি ওর কথা

'তাই বলুন! মাও

দৈতরির কথা বুঝে উঠতে না পেরে চারদিকে তাকালাম। খানিক আগে আমার হেঁটে আসা রাস্তা দিয়েই একটা রিকশা আসছে। ঝাঁকুনিতে দেবী আগাগোড়া ঝনঝন করে নড়ে উঠছে যেন। ইস, এতটা পথ এই ঝাঁকুনি।

বিল পেছনে রেখে আমি, দৈতরি, আজুবাঈ রিকশার জন্যে দাঁড়িয়ে রইলাম। দেবী নামতেই বললাম, 'চিনে চিনে এলে কি করে?'

'নতুন বাজারের সবাই তো দৈতরির বন্ধু গো। চিনবে না মানে!' তারপর দম নিয়ে দৈতরিকে বললো, 'একগ্লাস জল নিয়ে আয় আগে। কি রাস্তা!'

জরিপাড় শাড়ি, মাথায় আঁচলের উজ্জ্বল পাড়টুকু ঘোমটার ভাঁজ ফেলে স্থির হয়ে আছে। বিলের গেলাপি শালুক ফুল, পুরনো ঠাসা দাম, শাদা বক, টিয়ার ঝাঁক—এখানেই তোমাকে মানায় দয়া।

দৈতরি দৌড়তে দৌড়তে ছুটেছে।

'তুমি আজু? ঘরে পান আছে?'

মাথা নাড়ল হাসি মুখে।

'যাও তো এক খিলি সেজে নিয়ে এসো। মুখ শুকিয়ে গেছে।'

উড়িষ্যার জঙ্গলে ঠিকেদারের কাঠ কাটতে গিয়ে ওর মাকে বিয়ে করে এনেছিল এদেশের মানুষ। আজু ধীরে সুস্থে দুলে দুলে ঘরের দিকে যাচ্ছিল। আমি তাকিয়েছিলাম।

দেবী ধমকে উঠলো, 'কিরকম মানুষ তুমি বলো তো?'

আমি কাঁটা হয়েই ছিলাম।

'স্টেশন থেকে ফিরে দেখি সদর দরজা খোলা। গরুটা দড়িতে পা লটকে খুঁটোর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে আছে। লোক ডেকে তবে ঠিক করলাম—'

যাক! অন্য কিছু নয়।

'তুমি কি মনে করে এতদূরে চলে এলে বলো তো!'

আমি চুপ করেই রইলাম। শেষে বললাম, 'আমি যে এখানেই—তা বুঝলে কি করে?'

'জানতাম এদিকেই আসবে। তবে এতদূরে চলে আসবে ভাবিনি। শ্মশান পেরিয়ে নবগ্রহতলায় এসে একবার ভাবি ফিরে যাই।—তারপর দেখি তোমার সিগারেটের খালি প্যাকেট পড়ে আছে—'

দৈতরির হাতে জল, থালায় শাদা বাতাসা। আজুর হাতে পান দু'খিলি।

আমরা নিলাম।

'মা, রাতটা এখানে থেকে যান।'

'বটে। তুমি কাল সকালের মধ্যে ফিরবে কিন্তু।' তারপর আজুর চিবুকে হাত দিয়ে একটু ছুঁয়ে নিল দেবী, 'এমন করিস কেন? এবারে ওর সঙ্গে আমাদের বাড়ি ঘুরে আসবি কিন্তু—'

রিকশাওয়ালা ভেঁপু দিতেই দেবী চেঁচিয়ে উঠলো, 'তুমি ফিরে যাও বাপু।'

‘এতটা রাস্তা মা—রাত হয়ে যাবে কিন্তু—’

‘আজ আমরা হেঁটে ফিরবো।’

বুঝলাম বলে লাভ নেই। অনেকদিন পরে দেবী ইচ্ছে খাটিয়ে নিজের জানান দিল এইমাত্র।

আজুবাঈ দৈতরির সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা এগিয়ে দিয়ে ফিরে গেল। তখন উঁচু বাঁধের ওপর দিয়ে শুধু আমরা দু’জনে হাঁটছি। গ্রাম, গাছপালার ওধারে কোথায় রেল লাইল পড়ে আছে বোঝার উপায় নেই কোনো। বিকেল পাঁচটা চল্লিশের ট্রেন ইলেকট্রিক বাঁশী বাজিয়ে কলকাতা যাচ্ছিল। বিল, ফাঁকা মাঠ রেলের বাকি আওয়াজটুকু আগাগোড়া মুছে নিয়েছে।

—